কেন একজন ধনী আর অন্যজন দরিদ্র, একজন শোষক আর অন্যজন শোষিত, একজন প্রতারিত ও একজন প্রতারণাকারী! ‘প্রকৃতির নিয়ম যেমন কর্ম তেমন ফল’ গ্রন্থটি পাঠ করে আমরা জানতে পারব কেন এমন হয়। সুপ্রাচীন বৈদিক জ্ঞানের দুই ধ্রুপদী গ্রন্থ ঈশোপনিষদ ও শ্রীমদ্ভাগবত নির্ভর ‘প্রকৃতির নিয়ম যেমন কর্ম তেমন ফল’ গ্রন্থটি কর্ম ও পুনর্জন্ম, স্বাধীন ইচ্ছা ও নিয়তি, কৃষ্টি ও মুক্তির সুপ্রাচীন রহস্যকে ব্যক্ত করছে। এই গ্রন্থটি আরও আমাদের প্রদর্শন করছে যে কিভাবে আমরা যোগ ও ধ্যানের প্রয়োগ কৌশল অভ্যাসের মাধ্যমে কর্মবন্ধন ছিন্ন করে পূর্ন স্বাধীনতা, আনন্দ আর পারমার্থিক সফলতা অর্জন করতে পারব।
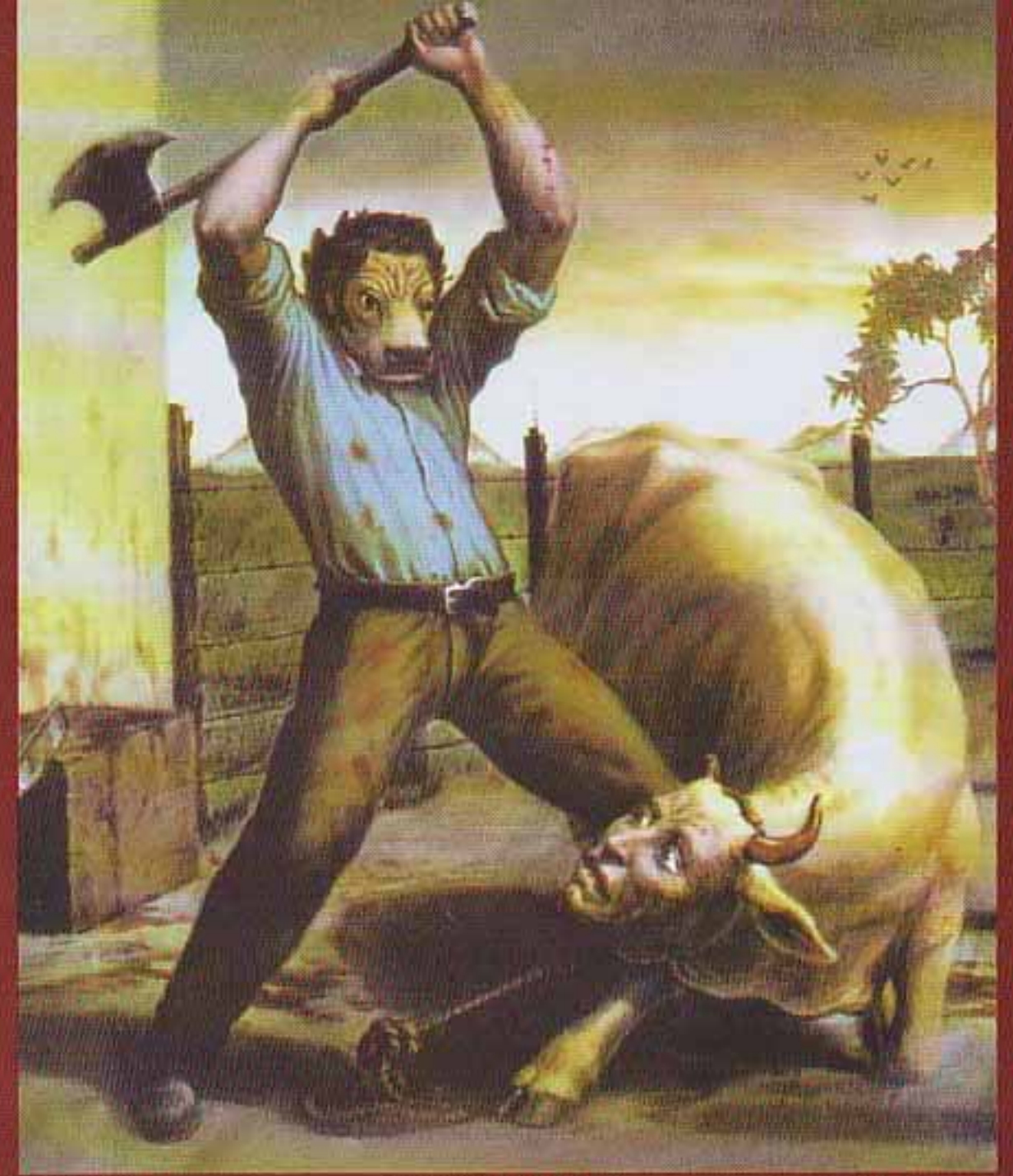
প্রকৃতির নিয়ম

যেমন কর্ম তেমন ফল

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকৃতির নিয়ম

যেমন কর্ম তেমন ফল

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

কর্তৃক রচিত

ইংরেজী The Laws of Nature : An Infallible Justice গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

The Laws of Nature : An Infallible Justice (Bengali)

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩০০০ কপি
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ, ৫০০০ কপি

মুদ্রণ ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
☎ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫, ২৪৫-৫৭৮

সূচীপত্র

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থাবলী ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ	কৃষ্ণ বড় দয়াময়
শ্রীমদ্ভাগবত (১ম-১২শ স্কন্ধ, ১৮ খণ্ড)	পরম পিতা
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (৪ খণ্ড)	শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে
গীতার গান	কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান
গীতার রহস্য	কৃষ্ণভক্তি প্রচারই প্রকৃত পরোপকার
লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ	হরেকৃষ্ণ চ্যালেঞ্জ
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা	পরলোকে সুগম যাত্রা
পঞ্চতত্ত্বরূপে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	বৈষ্ণব কে?
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু	বৈষ্ণব শ্লোকাবলী
শ্রীউপদেশামৃত	ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন
দেবহূতি নন্দন কপিল শিক্ষামৃত	প্রভুপাদ
কুন্তীদেবীর শিক্ষা	পাশ্চাত্যে কৃষ্ণভক্তির প্রচার
কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুপম উপহার	শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে পরম শান্তি (রঙীন)
ঈশোপনিষদ	পরম সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ
যোগসিদ্ধি	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মাহাত্ম্য
কৃষ্ণভাবনার অমৃত	শ্রীএকাদশী মাহাত্ম্য
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর	পঞ্চরাত্র প্রদীপ (শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতি)
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা	শ্রীমায়াপুর দর্শন
জীবন আসে জীবন থেকে	গৃহে বসে কৃষ্ণভজন
বৈদিক সাম্যবাদ	যুগধর্ম
অমৃতের সন্ধানে	ভক্তবৎসল ভগবান
ভগবানের কথা	ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)
ঈশ্বরের সন্ধানে	হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার (পাক্ষিক পত্রিকা)
জ্ঞানকথা	

বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
ডি. বি-৪৫
সল্টলেক
কলকাতা-৭০০০৬৪

ভূমিকা

নিম্নশ্রেণীর পশুদের থেকে উচ্চতর এক বুদ্ধিবৃত্তিগত জীবরূপে মানুষ নিজেকে নিয়ে গর্ব বোধ করে। অথচ যখন সে তার লাভের জন্য প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনার্থে তার বুদ্ধির প্রয়োগ করে, তখন সে যেন অপরিচালনীয় সমস্যার গভীরতর পঙ্কিলভূমিতে ডুবে যেতে থাকে। যানবাহনের ইঞ্জিনের ফলে আমাদের গমনাগমন আরও দ্রুততর হয়েছে, কিন্তু তার ফলস্বরূপ শ্বাসরুদ্ধকর বায়ুদূষণ, 'গ্রীন হাউস ইফেক্ট', এবং ভয়ঙ্করভাবে তেলের উপর নির্ভরতা বেড়েছে। আণবিক শক্তির উৎপাদন আমাদের সস্তায় শক্তি প্রদান করছে, কিন্তু তা আমাদের বিপুল ধ্বংসকারী অস্ত্র, চেরোনবিলের মত বিপর্যয় ও বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের দিকেও নিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক কৃষিব্যবসায় নানান ধরনের উৎপাদন হচ্ছে এবং বৃহৎ বিভাগীয় বিপনীগুলিতে খাদ্যেরও প্রাচুর্য রয়েছে, কিন্তু এর ফলে পারিবারিক কৃষিজমির মৃত্যু ঘটছে, ভূনিম্ন জলস্তরের দূষণ ঘটছে, মাটির মূল্যবান সর্বোচ্চ স্তরের ক্ষতি হচ্ছে এবং আরও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

এটা পরিষ্কার যে আমাদের নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতির বিধানকে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা 'কিছু' হারাচ্ছি। সেই 'কিছু'টি কি? উপনিষদ নামক প্রচীন ভারতীয় জ্ঞান গ্রন্থের ইশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটির মধ্যেই আমরা প্রাপ্ত হই যে, "এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু আছে তার মালিক পরমেশ্বর ভগবান এবং সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। একজনের তাই সেইটুকু জিনিসই গ্রহণ করা উচিত যেটুকু তার প্রয়োজন, যেটুকু তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, এবং সবকিছুই যে ভগবানের সম্পত্তি তা ভালভাবে জেনে, কখনই অন্যের জিনিস গ্রহণ করা উচিত নয়।"

প্রকৃতিতে আমরা দেখি যে এই সূত্রই কাজ করছে। ভগবানের দ্বারা গঠিত হয়ে প্রকৃতির আয়োজন পশু ও পক্ষীদের প্রতিপালন করছে। হাতী দৈনিক পঞ্চাশ কিলো খাদ্য গ্রহণ করছে আর পিপড়ে তার জন্য কয়েকটি শস্যদানা গ্রহণ করছে। মানুষ যদি হস্তক্ষেপ না করে তাহলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যই সকল জীবকে পালন করে।

যে কোন কৃষিবিদ আপনাকে বলবে যে এই পৃথিবী তার বর্তমান জনসংখ্যার দশগুণ জনসংখ্যাকে খাওয়ানোর জন্য শস্য উৎপাদন করতে

পারে। কিন্তু রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ, অন্যায় ভূমিবন্টন, খাদ্যের বদলে চা, কফি ও তামাক জাতীয় পণ্যের উৎপাদন এবং অপব্যবহারজনিত ক্ষয়ের ফলে আমেরিকার মতো ধনী দেশেও লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার্ত থাকছে।

যিনি প্রকৃতির বিধান সৃষ্টি করেছেন, আমাদের অবশ্যই সেই পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতির বিধানকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। তাঁর দৃষ্টিতে এই পৃথিবীর সকল অধিবাসীগণ-তা সে ভূমি, জল বা বায়ুর জীবই হোক না কেন-সকলেই তাঁর পুত্র কন্যা। আর আমরা মনুষ্য অধিবাসীরা, তাঁর জীবদের মধ্যে "অতি উন্নত" গণ এই সমস্ত পুত্র কন্যাদের সঙ্গে নির্মম ব্যবহার করছি। আমরা পশু হত্যা করছি, অরণ্য ধ্বংস করছি। অতএব আমরা যে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ, অন্তহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভোগ করব, এতে কি আশ্চর্যের কিছু আছে?

আমাদের সমস্যার উৎসটি হচ্ছে কারোর অধিকারসমূহের বিবেচনার অতীত ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষা। এই সমস্ত অধিকারগুলি হচ্ছে পিতার সঙ্গে সম্পর্কিত সন্তানের অধিকারসমূহ। প্রত্যেক সন্তানেরই তার পিতার সম্পদের অংশীদারের অধিকার রয়েছে। তাই, পৃথিবীতে সমস্ত জীবের মধ্যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি নির্ভর করছে ভগবানের সর্বজনীন পিতৃত্বের উপর।

আমরা দেখেছি যে বৈদিক সাহিত্য ঘোষণা করছে যে পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির মালিক ও নিয়ন্তা। একটি ঘাসও তাঁর অনুমোদন ব্যতীত নড়ে না। তিনি হচ্ছেন সামগ্রিকভাবে পূর্ণ। তাহলে আমাদের অবস্থানটি কী? বৈদিক সাহিত্যেই আবার আমরা এর উত্তরটি পাই। প্রকৃতিগতভাবে আমাদের স্বাভাবিক ভূমিকাটি হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। তিনি পরম ভোক্তা আর আমরা হচ্ছি তাঁর সেবা করার মাধ্যমে তাঁর ভোগে অংশগ্রহণকারী; আলাদাভাবে ভোগ করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে নয়। আমাদের নগণ্য স্বতন্ত্রতা তার সামগ্রিক স্বতন্ত্রতার এক ক্ষুদ্র প্রকাশ মাত্র। তাঁর কাছ থেকে ভিন্নভাবে উপভোগের চেষ্টা হচ্ছে আমাদের সেই নগণ্য স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার, যার ফলস্বরূপ আমাদের বর্তমান সংকটাবস্থা।

আমরা কেন আমাদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করি? কেননা আমাদের বাস্তব স্বভাবে আমরা হচ্ছি অজ্ঞ। বৈদিক জ্ঞানের প্রথম শিক্ষাই হচ্ছে যে আমরা দেহ নই বরং আমরা হচ্ছি চিন্ময় আত্মা-চেতনার অংশকণা মাত্র

দেহাভ্যন্তরে বাস করে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। ঠিক যেমন, একটি গাড়ি হচ্ছে যন্ত্র আর সেখানে একজন চালক থাকে। সে গাড়িটিকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তেমনই দেহ হচ্ছে একটি যন্ত্র আর চিন্ময় আত্মা সেটিকে সচল করে ভগবানের জড়া প্রকৃতির মধ্যেকার অনুভূতি ও ভাবনা প্রাপ্ত হয়। আমরা যখন আমাদের প্রকৃত পরিচয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে আমরা হচ্ছি চিন্ময় আত্মা এবং আমরা পরমাত্মা ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ তখন আমরা এও হৃদয়ঙ্গম করি যে ঠিক যেভাবে হাত বা পা সমগ্র শরীরের সেবা করে আমরাও সেভাবে তাঁর সেবার জন্য।

আমাদের সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের পরিচিতি যে দেহ হতে ভিন্ন সেটি আমরা ভুলে গিয়ে ভুলভাবে নিজেদের দেহকে আমি মনে করি। যদি কোন ব্যক্তি আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করে সে নিজেকে একজন আমেরিকান বলে মনে করে, যদি সে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করে তবে নিজেকে সে একজন ফ্রান্সের মানুষ বিবেচনা করে ইত্যাদি। আমরা আমাদেরকে আমাদের লিঙ্গ, জাতি, বংশ, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি অনুসারেও পরিচয় করাই। কিন্তু এই সমস্ত গুণসমূহ কেবলমাত্র দেহের উপরই প্রয়োগ করা যায়, আত্মার উপরে নয়। তাই, এই সমস্ত কিছুকে আমাদের প্রকৃত পরিচয় রূপে গ্রহণ করার ফলে আমরা ভগবান এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটিকে ভুলে যাই আর নিজেদেরকে তাঁর জড়া প্রকৃতির স্বাধীন উপভোক্তারূপে দর্শন করি।

বৈদিক সাহিত্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে মনুষ্য কার্যাবলী যখন ভগবৎ সেবা বিহীন থাকে তখন কর্মের বিধান নামক সূক্ষ্ম আইন দ্বারা তা পরিচালিত হয়। এই হচ্ছে সেই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার আইন যেখানে এই পৃথিবীতে আমরা যা করি তার ফলস্বরূপ সুখ অথবা দুঃখ প্রাপ্ত হই। আমি যদি অন্য জীবের ব্যথার কারণ হই তাহলে নিশ্চিতরূপে জীবন চক্রের গতিতে আমি তেমনি ব্যথা ভোগ করতে বাধ্য। এবং যদি আমি কারোর জীবনে সুখ আনয়ন করি, তেমনি সুখ আমার জন্যও অপেক্ষা করবে। প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি নিঃশ্বাসে, আমাদের এই জড় জগতের কার্যকলাপ সুখ ও দুঃখের কারণ। এই অন্তহীন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া পূর্ণ হতে এক জন্মেরও বেশী প্রয়োজন। তাই পুনর্জন্ম রয়েছে।

এখনও পর্যন্ত পুনর্জন্মের ধারণা ভারত ও প্রাচ্য দেশগুলিতে সর্বজনীনভাবে গৃহীত হলেও, পাশ্চাত্যে এর কিছু সমর্থক পাওয়া যায়। কয়েক শতাব্দী পূর্বেই চার্চ এই পুনর্জন্মের দর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সে অনেকদিন আগেকার ইতিহাস, ৩০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সে এক দীর্ঘ কাহিনী। এই বিষয়ের অবতারণার সুযোগ এই গ্রন্থে নেই, তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ধারণা নস্যাৎ করার ফলে বিশ্বের মতামতের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের মানুষের দিক থেকে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

যাই হোক, গত কয়েক দশকে পাশ্চাত্যের অনেক চিন্তাবিদ পুনর্জন্মের ধারণাকে ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। যেমন এমোরি ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুলের ডঃ মাইকেল সাবোম "Recollections of Death : A Medical Investigation" (১৯৮২) নামে একটি বই লিখেছেন, যেখানে তার বিস্তৃত গবেষণায় হৃদরোগের রুগীদের দেহের বহির্গমন অভিজ্ঞতা প্রতিপন্ন করেছেন। সাবোম লিখেছেন "কোন কোন ধর্মীয় মতবাদ অনুযায়ী দেহগত চূড়ান্ত মৃত্যুর পরেও আত্মার যেমন অস্তিত্ব থাকে সেইভাবে দেহগত মস্তিষ্ক থেকে ভিন্ন হয়ে মনও কি অস্তিত্ব রক্ষা করে?"

আর ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটির এক মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ আয়ান স্টিভেনসন তার Twenty Cases Suggestive of Reincarnation (১৯৬৬) নামক গ্রন্থে শিশুদের পূর্বজন্মের স্মৃতি প্রামাণিকভাবে সত্য প্রতিপাদন করেছেন। অন্যান্য আরও নানা পন্থার গবেষণার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে পাশ্চাত্যের প্রথমসারির বিজ্ঞানীদের কাছেও পুনর্জন্মের ধারণাটি শীঘ্রই স্বীকৃতি লাভ করতে চলেছে।

মানুষের নিয়তি বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বৈদিক সাহিত্যে আত্মার পুনর্জন্মকে কেন্দ্রীয় বিষয় করা হয়েছে। যুক্তিটি স্পষ্ট মনে হয় তখনই যখন আমরা একটি সাধারণ প্রশ্ন বিবেচনা করি যে কেন একটি শিশু আমেরিকার ধনী পিতামাতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করছে আর আরেকটি শিশু ইথিওপীয়ার ক্ষুধার্ত কৃষক পরিবারে জন্মাচ্ছে? কেবলমাত্র কর্ম ও পুনর্জন্মের মতবাদই-পুরস্কার ও শাস্তি যা বহু জীবনে নীত হয়-এই প্রশ্নের সহজ উত্তর দিতে পারে।

প্রকৃতির নিয়ম, যেমন কর্ম তেমন ফল গ্রন্থটি প্রাথমিকভাবে দুটি উৎস থেকে সংকলিত হয়েছে। প্রথমটি হল কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ দ্বারা শ্রীঈশোপনিষদের উপর প্রদত্ত প্রবচনমালা। এই প্রবচনসমূহ তিনি ১৯৭০ সালের বসন্তকালে লস এঞ্জেলেসে প্রদান করেছিলেন। এই প্রবচনে কিভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে সেকথা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় উৎসটি হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ ও তাৎপর্য। তাঁর এই বিশাল মূল্যবান গ্রন্থের তৃতীয় স্কন্ধের "ভগবান কপিলদেব কর্তৃক অশুভ সকাম কর্মের বর্ণনা" নামক ত্রিংশতি অধ্যায় হতে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশটি গৃহীত হয়েছে। এই দ্বিতীয়ভাগে ভগবানের আইন লঙ্ঘনকারী পাপাত্মাদের ভাগ্য সম্বন্ধে জানতে পারব যারা কর্মফল অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করে।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর এক ঈশোপনিষদ প্রবচনে বলেছেন, "তুমি যদি ভাল কাজ কর, তুমি পরবর্তী জন্মে তথাকথিত আনন্দ উপভোগ করবে কিন্তু তুমি জন্ম মৃত্যুর চক্রের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। যদি তুমি খারাপ কর্ম কর তাহলে তুমি পাপের ফল ভোগ করবে এবং তোমাকেও জন্ম মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে। কিন্তু তুমি যদি কৃষ্ণের জন্য কাজ কর সেখানে খারাপ বা ভালো এরকম কোন প্রতিক্রিয়া নেই এবং মৃত্যুর সময় তুমি কৃষ্ণের কাছে ফিরে যাবে। কর্মবন্ধন ছিন্ন করার এটিই একমাত্র উপায়।"

এইভাবে ইতিপূর্বে উল্লেখিত সামগ্রিক সামাজিক দুঃখ কষ্টও লাঘব হতে পারে। আমরা যতক্ষণ এই জগতে রয়েছি ততক্ষণ সামগ্রিকভাবে দুঃখ মুক্ত হবার কোন সুযোগ নেই কেননা বৈদিক শিক্ষায় স্বীকার করা হয়েছে এই জড় জগত স্বাভাবিকভাবেই একটি দুঃখালয়। বিশাল প্রাকৃতিক শক্তির মাঝে শেষ পর্যন্ত আমরা শক্তিহীন। অতএব, প্রকৃতির নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছাটি জানা ও অনুসরণ করাই একমাত্র দুঃখ নিবৃত্তির আশা। প্রকৃতির নিয়মঃ যেমন কর্ম তেমন ফল। একমাত্র ভগবৎ সেবার পথেই আমরা প্রকৃতির বিধানকে অতিক্রম করতে পারি, পুনর্জন্ম চক্রের অবসান ঘটাতে পারি এবং জীবনের পূর্ণতা, ভগবৎ প্রেম লাভ করে তাঁর ধামে স্থান পেতে পারি।

প্রথম অধ্যায়

ভগবান এবং কর্মনীতি

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হল বেদ। ১০৮ টি উপনিষদেই এর দার্শনিক সারমর্মকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সকল উপনিষদের মধ্যে শ্রীঈশোপনিষদই হল সর্বোত্তম। নিম্নলিখিত নিবন্ধটির মাধ্যমে, ১৯৬৮ সালে শ্রীঈশোপনিষদ বিষয়ে প্রদত্ত শ্রীল প্রভুপাদের প্রবচনের ভিত্তিতে আমরা পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব, তাঁর জাগতিক ও পারমার্থিক শক্তিরাজির নিয়ন্ত্রণকারী বিধিগুলো এবং কিভাবে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করা যায়, সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারব।

ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান হলেন "পূর্ণাৎ পূর্ণম্"। এই জড় জগতের জন্য তিনি অনেক কিছুর আয়োজন করে রেখেছেন। তারই অংশ হল সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় প্রক্রিয়া। সেইসাথে প্রতিটি জীবের পরিবর্তনের জন্য রয়েছে ছ'টি সুনির্দিষ্ট ধারা। সেগুলি হল—জন্ম, বিকাশ, স্থিতি, উৎপাদন, ক্ষয় এবং বিনাশ। উপরিউক্ত ছয়'টি ধারার মধ্য দিয়েই জীব জন্ম থেকে বিনাশের দিকে এগিয়ে চলে। আর এটিই জড়া প্রকৃতির নিয়ম। যেমন একটি ফুল কুঁড়ি রূপেই জন্মায়। তারপর সেটি বিকশিত হয়, দুই-তিন দিন সতেজ থাকে, বীজ উৎপাদন করে, ক্রমে সেটি শুকিয়ে আসে ও একসময় ঝরে পড়ে। জড় জাগতিক বিজ্ঞান দিয়েও কেউ একে রোধ করতে পারে না। আর এরূপ রোধের চেষ্টা যদি কেউ করে, তবে তা হবে নিতান্তই অজ্ঞতার প্রকাশ।

কখনও কখনও অনেকে বোকার মতন মনে করে যে, বৈজ্ঞানিক উন্নতি বিকাশের মাধ্যমে মানুষ বুঝি অমর হয়ে যাবে। এই রকম ভাবনা শুধু বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ জড়া প্রকৃতির বিধানকে কেউ-ই আটকাতে পারে না। তাই ভগবদ্গীতায় (৭/১৪) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, জড়-জাগতিক শক্তি দুরত্যয়া, অর্থাৎ কোনরকম জড় জাগতিক পদ্ধতির মাধ্যমে একে কখনই জয় করা যায় না।

জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ রয়েছে। অর্থাৎ এটি তিন রকম গুণের সমন্বয়ে গঠিত। এইগুলি হল ঃ সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ। যার অর্থ হল যথাক্রমে শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব, উগ্র রাজসিক ভাব এবং নিম্নমুখী অজ্ঞ তামসিক ভাব। এই গুণ শব্দের আরেকটি অর্থ হল 'দড়ি'। সুতোর তিনটি পাকের মাধ্যমে দড়ি তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে সুতোকে প্রথমে ছোট ছোট তিনটি কাঠিমে জড়ানো হয়। তারপর সেগুলোকে একসাথে পাকানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় তৈরি দড়িটি খুবই মজবুত

হয়। সেরকমই জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সত্ত্ব, তমো ও রজো একসাথে মিশে যায়। পরে সেগুলো থেকেই অন্যাণ্য গুণের উদ্ভব হয়। আবার সেই গুণগুলিও বারংবার পরস্পরের সাথে মিশে নতুন গুণ তৈরি করে। আর এইভাবে অসংখ্যবার তাদের পরস্পরের মধ্যে সংমিশ্রণ চলতে থাকে। আর এইভাবেই জাগতিক শক্তি আপনাকে ক্রমাগত জড়িয়ে ফেলতে থাকে। নিজের চেষ্টায় আপনি এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবেন না। একে প-বর্গ বলা হয়। সংস্কৃত বর্ণমালার পঞ্চম সারির বর্ণ হল প-বর্গ। এতে রয়েছে প, ফ, ব, ভ, ম। 'প' দ্বারা বোঝানো হয় 'পরিশ্রম', অর্থাৎ অত্যধিক কষ্টসাধন। প্রতিটি জীবই এই জগতে বেঁচে থাকার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে। যাকে বলা হয় অস্তিত্বের জন্য কঠোর জীবন সংগ্রাম। 'ফ' দ্বারা বোঝানো হয় ফেনা। ঘোড়া যখন অত্যধিক পরিশ্রম করে তখন তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরোয়। সেরকমই, অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমাদের জিহ্বা শুকিয়ে যায়, মুখের মধ্যে লালা জমে। প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার জন্য এইরকম অত্যধিক পরিশ্রম করছে। যার ফলে তাদের মুখে ফেনা উঠে আসে। 'ব' দ্বারা বোঝানো হয় 'বন্ধন'। আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আমরা বাঁধা পড়ে আছি। 'ভ' দ্বারা বোঝানো হয় 'ভয়'। এই জড় জগতে মানুষ সব সময়ই ভয়ের জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে বাস করছে। কেউ-ই জানে না যে পরমুহূর্তে কি হতে চলেছে? এবং 'ম' দ্বারা বোঝানো হয় 'মৃত্যু'। আমাদের আশা, সুখ ও নিরাপত্তার জন্য যাবতীয় পরিকল্পনা—সবই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায়।

এজন্য, কৃষ্ণভাবনাময় জীবন-দর্শনে এই প-বর্গ পদ্ধতিকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে মানুষ অপবর্গ অর্জন করে। যেখানে অস্তিত্বের জন্য কঠোর পরিশ্রমের ভাবনা থাকে না, এছাড়াও থাকে না কোনও রকম জাগতিক বন্ধন, ভয় বা মৃত্যুর আশঙ্কা। এই জড়জগৎকেই প-বর্গের মাধ্যমে বোঝানো হয়। কিন্তু প-বর্গের পূর্বে 'অ' উপসর্গটি যোগ করলে প-বর্গকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়। আর কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনই অপবর্গের একমাত্র পথ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে কিছুই জানে না। যার ফলে তারা তাদের জীবনকে নষ্ট করছে। এই আধুনিক সভ্যতা একটি আত্মহননকারী সভ্যতা, যেখানে মানুষ নিজেদেরকে হত্যা করছে। কারণ তারা জানে না যে যথার্থ জীবন-ধারা কি হওয়া উচিত? যেমন পশুরা জানে না যে যথার্থ জীবন কি? তাই তারা প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ীই সাধারণভাবে জীবন যাপন

করে চলে, ক্রমাগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। মানুষও তেমনি পশুদের মতন সাধারণ জীবন যাপন করে চলছে।

কিন্তু যখন আপনি মনুষ্য-দেহ পান তখন ভিন্ন ধারায় জীবন যাপনের দায়িত্ব আপনারও চলে আসে। আর তার ফলেই আপনি কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার সুযোগ পাবেন। যার মাধ্যমে সমস্ত রকম সমস্যা থেকে সমাধানের পথ খুঁজে পেয়ে আপনি মুক্তি পেতে পারেন। কিন্তু তা না করে যদি আপনি পশুর মতন জীবন যাপন করতে থাকেন, তবে পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন চক্রে প্রবেশ করে আপনাকে চুরাশী লক্ষ জীব যোনির মধ্য দিয়ে চলতে হবে। ফলে আরও একবার মনুষ্য-জন্ম ফিরে পেতে আপনার বহু লক্ষ কোটি বছর কেটে যাবে। যেমন ধরুন, এই মুহূর্তে আপনারা যে সূর্যকিরণটি দেখতে পাচ্ছেন, সেটি আবার দেখতে হলে আপনাকে চব্বিশ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। কারণ প্রকৃতির সবকিছুই একটি নির্দিষ্ট চক্রে আবর্তিত হয়ে চলেছে। কিন্তু আপনি যদি নিজেকে উন্নত করার এই সুযোগ নষ্ট করেন, তবে আবার আপনাকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন চক্রে প্রবেশ করতে হবে। প্রকৃতির বিধান খুব কঠোর। এই জন্যই আমরা এত সব কেন্দ্র স্থাপন করেছি, যাতে করে মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃতের সুযোগ-সুবিধাগুলো গ্রহণ করে নিজেদের বিকাশ সাধন করতে পারে।

আমরা জানি না, আমাদের মৃত্যুর আর কত দেরী। শরীরের মধ্যে আমাদের অবস্থানের সময় ফুরিয়ে এলে মৃত্যুকে কেউ আটকাতে পারবে না। এইজন্য এক্ষুনিই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। জড়া প্রকৃতির বিধি-নিয়ম এমনই কঠোর যে সেখানে আপনি বলতে পারবেন না "আমাকে থাকতে দাও"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ এরকম অনুরোধই করে। আমি যখন এলাহাবাদ ছিলাম, তখন আমার এক পুরানো বন্ধু খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি খুব ধনী ছিলেন। তিনি ডাক্তারকে খুব অনুনয়-বিনয় করে বলতেন, "আমাকে আর চারটি বছর বাঁচিয়ে রাকতে পারবেন না? তাহলে আমি কতগুলি অসমাপ্ত কাজ শেষ করে ফেলতে পারতাম।" এটাই নির্বুদ্ধিতা। প্রত্যেকেই ভাবে "আমাকে এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে।" কিন্তু তারা এটা বোঝে না যে, ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিক—কেউই মৃত্যুকে আটকাতে পারে না। চার বছর কেন, চার মিনিটও অতিরিক্ত বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, আয়ু ফুরিয়ে এলে আপনাকে তক্ষুণি চলে যেতে হবে। এটাই নিয়ম। তাই সেই মুহূর্তটি আসার আগেই, আপনাকে প্রস্তুত হতে হবে। যত শীঘ্র সম্ভব কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। অর্থাৎ আপনার পরবর্তী মৃত্যুর দিনটি আসার

আগেই আপনাকে আপনার কর্তব্য শেষ করতে হবে। এটাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। নতুবা আপনাকে হার স্বীকার করতে হবে।

ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে যে, পরম পূর্ণ সত্তা—পরমেশ্বর ভগবান-তাঁর থেকে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তা সবই স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই আপনি যদি আপনার এই দুর্লভ মানব-জীবনের সদ্ব্যবহার করতে চান, তার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এজন্য আপনাকে এগিয়ে এসে অনুশীলন করতে হবে। মনে রাখবেন, কৃষ্ণভাবনামৃত কিন্তু নিছক তত্ত্বকথা নয়, এটি বাস্তবসম্মত। এর ওপর সমস্ত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। তাই ঈশোপনিষদে যেমন বলা আছে, সেরকমই প্রতিটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র সত্তা-যেমন আমরা, প্রত্যেকেরই পরম পূর্ণ সত্তা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে সম্পূর্ণ উপলব্ধির পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। যদিও আমরা সম্পূর্ণ সত্তা, কিন্তু আমরা অতি ক্ষুদ্র।

একটি ছোট স্ক্রু যদি মেশিন থেকে আলগা হয়ে খুলে পড়ে, তবে তার আর কোনও গুরুত্ব থাকবে না। ঠিক সেরকমই, ততক্ষণই আমাদের গুরুত্ব যতক্ষণ আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখব। নইলে কিন্তু সবই ব্যর্থ ও মূল্যহীন।

পরমপূর্ণ সত্তাটিকে বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে সেই পরমপূর্ণ সত্তার সাথে আমাদের সম্পর্কটি কি? পরমপূর্ণ সত্তা সম্বন্ধে আমাদের জানা সম্পূর্ণ নয়। তাই তার সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতাও অসম্পূর্ণ। আমরা মনে করি, 'আমি ভগবানের সমান। আমিই ভগবান।' এটাই কিন্তু অসম্পূর্ণ জ্ঞান। কিন্তু যদি আপনি মনে করেন, 'আমি ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশমাত্র এবং সেইজন্য গুণগত দিক দিয়ে আমি ভগবানের সমকক্ষ'—তবে সেটিই হবে সম্পূর্ণ জ্ঞান। জীবের পরিপূর্ণ চেতনা জাগরিত করবার সুযোগ হচ্ছে এই মানব-জন্ম।

কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদনের মধ্য দিয়েই আপনি এই পূর্ণ চেতনার পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। আর আপনি যদি এই পূর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করেন, তবে জানবেন, আপনি নিজেকে নিজে শেষ করে ফেলছেন, আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। যেমন ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, "আত্মাকে যে হত্যা করে, সে যেই হোক, তাকে মৃত্যুর পর অজ্ঞতা, অন্ধকার ও অবিশ্বাসের জগতে প্রবেশ করতেই হবে।" আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না নিজের আত্মার হননকারী হতে। এজন্য কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের মাধ্যমে আপনার মানব-জীবনের সদ্ব্যবহার করুন। এটাই হল আপনার একমাত্র কাজ।

কর্মবন্ধন ছিন্ন করার পন্থা

আমাদের বদ্ধ জীবনধারায় প্রতি পদক্ষেপেই আমরা না জেনে বিভিন্ন রকম পাপ কাজ করে চলেছি। আসলে জন্ম থেকেই আমরা অজ্ঞতার মধ্যে রয়েছি বলে এইরকম অজ্ঞাতভাবে পাপ কাজ করে ফেলছি। এখন প্রশ্ন হল, এত অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও এই অজ্ঞতা এত প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে কেন? এর কারণ হল এত সব বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থকালেও সেগুলোতে আত্মতত্ত্ব, অর্থাৎ আত্মার বিজ্ঞান পড়ান হয় না। সেই জন্য সাধারণ মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারেই ডুবে থাকে। যার ফল স্বরূপ তারা পাপ করে সেই পাপের কর্মফল ভোগ করতে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/৫) এই কথাই বলা হয়েছে। *পরাভবস্তাবদ্ অবোধজাতো যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্।* অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে না পারছে, ততক্ষণ জীবের নির্বুদ্ধিতার দশা চলতেই থাকে। শিক্ষা-দানকারী এই সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোও অজ্ঞতার প্রসার ঘটাচ্ছে। যতক্ষণ অবধি না একজনের মনে চিন্তা আসে, 'আমি কে? ভগবান কি? এই জগৎটা কি? পরমেশ্বর ভগবান ও এই জগতের সাথে আমার সম্পর্ক কি?'—এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর যতক্ষণ না খুঁজে পাচ্ছে, ততক্ষণ প্রত্যেকেই পশুর মতন নির্বোধ থাকে এবং বিভিন্ন জীবনের মধ্য দিয়ে নানা প্রজন্মে দেহান্তরিত হয়ে চলে। এটাই হল অজ্ঞতার ফল।

তাই আধুনিক সভ্যতা খুবই বিপজ্জনক। হয়ত সফল ব্যবসায়ী বা রাজনীতিক হয়ে এযুগে একজন নিজেকে সুখী মনে করতে পারেন, অথবা আমেরিকার মতন ধনীদেশে জন্ম পেয়ে কেউ অধিক স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারেন, কিন্তু এসবই অস্থায়ী। তাদের এই সব আপাত সুখী-জীবনের একসময় পরিবর্তন হয়ে যাবে, তাছাড়া আমরা কেউ-ই জানি না, এই জীবনে পাপপূর্ণ আচরণের জন্য পরজন্মে আমাদের কি রকম দুঃখ ভোগ করতে হবে। এজন্য কেউ যদি পারমার্থিক অনুশীলন শুরু না করে তবে অবশ্যম্ভাবীভাবে তার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে। যেমন মনে করুন, শক্তি সমর্থ ও স্বাস্থ্যবান একজন ব্যক্তি কোনও একটি দূষিত পরিবেশে বাস করছে। তবে কি সে সুস্থভাবে জীবন কাটাতে পারবে? যে কোনও মুহূর্তে সে রোগাক্রান্ত হতে পারে। এইজন্য পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান অনুশীলনের মধ্য দিয়েই আমাদের নিজেদের জীবনের অজ্ঞতা দূর করা উচিত।

অজ্ঞানতাবশত কিভাবে আমরা পাপ কাজ করি, তার একটি সুন্দর উদাহরণ হল খাদ্যগ্রহণ। *ভগবদ্গীতায়* (৩/১৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তার ভক্তরা সমস্ত রকম পাপকর্ম থেকে মুক্ত হন, কারণ তারা ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত

খাদ্যসামগ্রী প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করেন। সেই সাথে তিনি এও বলেছেন যে, যারা নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য রান্না করে, তারা শুধু পাপই ভোজন করে। প্রকৃতপক্ষে মন্দিরের পরিবেশ আর সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে রান্নাবান্না ও খাওয়া দাওয়া আপাতদৃষ্টিতে একই রকম মনে হলেও তাদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। মন্দিরের পরিবেশে রন্ধন ও আহার্য প্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা পাপমুক্ত হই। কিন্তু অভক্ত কারও রান্নাবান্না ও খাদ্যগ্রহণ তাকে আরও বেশী পাপময় কর্মফলে আবদ্ধ করে। প্রকৃতপক্ষে মন্দিরের পরিবেশে সকল প্রকার রন্ধন ও আহার্য দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে প্রসাদ রূপে গ্রহণ করা হয় বলে সেখানে কোনও রকম পাপ প্রবেশ করতে পারে না। কৃষ্ণভাবনাময় সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের বাইরে আপনি যা কিছুই করুন না কেন তা জড়া প্রকৃতির দোষে আপনাকে আবদ্ধ করে। এইভাবে বিভিন্ন কাজকর্ম না জেনে করার ফলে আপনি পাপকর্মে জড়িত হয়ে পড়ছেন। কিন্তু একটু সচেতনভাবে চললেই আমরা এই পাপকর্ম থেকে নিজেদের সরিয়ে পূণ্য কাজ করতে পারি। কিন্তু অনেকে পূণ্য কাজ করতে গিয়ে জটিলতার আবর্তে জড়িয়ে পড়েন। যদি কোনও ব্যক্তি পূণ্যবান হন তিনি পর জন্মে কোনও ধনী বা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নিতে পারেন বা হয়ত উচ্চশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেতে পারেণ। এগুলো সবই পূণ্য কর্মের ফল। কিন্তু আপনি পুণ্যবান বা পাপী যাই হোন না কেন, আপনাকে কোনও একজন মায়ের গর্ভে প্রবেশ করতেই হবে। আর সেটিই হবে ভয়ানক দুর্দশা। সেখানে আপনি ধনী বা সম্ভ্রান্ত যে পরিবারেই জন্মান না কেন অথবা কোনও পশুর গর্ভে জন্ম নিন, আপনাকে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ও ব্যধির আবর্তন চক্রের মধ্য দিয়ে কষ্ট ভোগ করতেই হবে। এটাই আমরা বারবার ভুলে যাই।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হল আপনাকে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ও ব্যধির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সুযোগ দেওয়া। কিন্তু আপনি যদি পাপকর্ম করতেই থাকেন আর সেই সাথে পাপপূর্ণ আহার গ্রহণ করেন, তবে উপরিউক্ত চারটি দুর্দশা চলতেই থাকবে। আর পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্তি পাবেন শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। যেরকম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) বলে গেছেন—"সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব।" শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণের একটি পন্থা হল, এমন কিছু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ না করা যেটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়নি। এই বিষয়ে আমাদের বিশেষ যত্নবান হতে হবে। মনে রাখবেন, যদিও আমরা কোনও পাপকর্ম করে থাকি, তবু ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে আহার্য নিবেদনের পর সেই প্রসাদ আহার রূপে গ্রহণ করলে, পাপকর্মের বিষময় ফলভোগের থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। আর এইভাবে যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করি তবে তিনি আমাদের সকল প্রকার পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করবেন। এটি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি।

এইভাবে আত্মসমর্পণ করলে ভগবদ্ভক্ত মৃত্যুর পর কোথায় যান? শূন্যবাদী দার্শনিকরা যেমন বলেন, তেমন করেই কি একজন ভক্তের জীবন শেষ হয়? না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মাম্ এতি*—"সে আমার কাছে আসে।" আর সেখানে গিয়ে কী লাভ হয়? তার উত্তর শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছেন, *মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ নাপ্নুবন্তি*—অর্থাৎ "আমার কাছে যে ফিরে আসে তাকে আর এই দুঃখময় নশ্বর সংসারে জন্ম নিতে হয় না।" সেটিই সর্বোচ্চ প্রাপ্তি।

ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, "আত্মাকে যিনি হত্যা করেন, তিনি যেই হোন না কেন, মৃত্যুর পর তাকে অবশ্যই অবিশ্বাস, অন্ধকার ও অজ্ঞতার জগতে প্রবেশ করতে হবে।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যদের কাছে সিংহের মতন আর ভক্তবৃন্দের কাছে মেষশাবকের মতন। কিন্তু নাস্তিকদের বক্তব্য, "আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিনি।" তারাও শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাবে। অন্তিম মুহূর্তে মৃত্যুময় সিংহ রূপে তিনি তাদের গ্রাস করবেন। নাস্তিকদের কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুরূপেই দেখা দেবেন। আর যারা ভগবানের ভক্ত তারা প্রেমিকরূপে অর্থাৎ মেষশাবকের মতো শান্ত রূপেই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাবেন।

প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেকেই হয় ভক্ত হয়ে অথবা বাধ্য হয়েই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত। যিনি জড় জাগতিক জীবন-ধারায় আবদ্ধ তিনিও শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত। কারণ তাকে শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতির সাহায্যে কাজ করতে হচ্ছে। এটা অনেকটা কোনও দেশের নাগরিকদের জীবনধারার মতন-সেখানে মানুষ সৎ নাগরিক বা দুষ্কৃতী যাই হোক না কেন, তাকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনতা মেনেই চলতে হয়। বিদ্রোহীরা বলতে পারে তারা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা মানে না, কিন্তু তখনই পুলিশ তাদের কারারুদ্ধ করে শাসন ব্যবস্থা মেনে চলতে বাধ্য করে।

সুতরাং, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন অর্থাৎ প্রত্যেক জীবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, এটি কেউ মানতে না চাইলেও তাকে দাস হয়েই থাকতে হবে। পার্থক্য এই যে, নাস্তিক বাধ্য হয়েই শ্রীকৃষ্ণকে তার প্রভুরূপে গ্রহণ করেন, আর ভক্তরা স্বেচ্ছায় আনন্দের সাথে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হন।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে শেখায় যে, প্রত্যেকেই আমরা ভগবানের নিত্য দাস। তাই আমাদের উচিত স্বেচ্ছায়, সানন্দে ভগবানের সেবায় আত্মনিবেদন করা। "নিজেকে ভগবান মনে করে মিথ্যা অহংকার কখনও করো না। ভগবানকে স্বীকার না করলেও তোমাকে তা করতেই হবে। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুও শ্রীভগবানকে গ্রাহ্য করতেন না। তাই স্বয়ং ভগবান এসে তাকে বধ করেন। সেরকমই নাস্তিকদের কাছে ভগবান মৃত্যু রূপে দেখা দেন, কিন্তু আস্তিক অর্থাৎ যারা ভগবানকে বিশ্বাস করেন তাদের কাছে তিনি প্রেমিকরূপে আসেন। এটিই হল পার্থক্য।

এটিই হল মূল দর্শন। আর আপনি যদি ভগবানের পরম ভক্ত হয়ে পারমার্থিক জীবন ধারায় এই দর্শন উপলব্ধি করতে পারেন, তা হলেই আপনার জীবন সার্থক। সেখানে আপনি এক মুহূর্ত বাঁচুন বা একশ বছর বাঁচুন—সেটা কোনও ব্যাপারই নয়। অন্যথায় বেঁচে থাকার কীই বা দরকার? কিছু গাছ যেমন পাঁচশ বা পাঁচ হাজার বছর অবধি বেঁচে থাকে। কিন্তু এইরকম উন্নত চেতনাবিহীন জীবন ধারণ শুধুই অর্থহীন।

আপনি যদি এটা জানেন যে, আপনি হচ্ছেন ভগবানের সেবক, আর সকল বস্তুই ভগবানের। তাহলে আপনি একশ বছর জীবিত থেকে আপনার কর্তব্যকর্ম করলেও কিন্তু আপনাকে তার কোন প্রতিক্রিয়া ভোগ করতে হবে না। *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) দৃঢ়ভাবে তা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধন*" "কৃষ্ণের প্রীতির জন্যই কেবল কর্ম করা উচিত। অন্যথায় ভাল অথবা মন্দ যে কোন কর্মই আপনাকে এ জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করবে।" আপনি যদি ভাল কর্ম করেন তাহলে পরবর্তী জীবনে তথাকথিত সুখভোগ করতে পারবেন। কিন্তু তবুও জন্ম-মৃত্যুর চক্রেরই আপনাকে আবদ্ধ থাকতে হবে। আর মন্দ কর্মের ফলে আপনাকে কষ্টভোগ করতে হবে এবং আপনি এজগতেই আবদ্ধ থাকবেন। কিন্তু আপনি যদি কৃষ্ণের প্রীতির জন্য কর্ম করেন তা ভাল অথবা মন্দ যাই হোক না কেন সেখানে এরকম কোন প্রতিক্রিয়া নেই এবং মৃত্যুর সময় আপনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যাবেন। কর্মবন্ধন ছিন্ন করার এটিই একমাত্র পন্থা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর নিয়ন্তা এবং প্রভু

ইশোপনিষদের 'ঈশ' শব্দটি পরম পুরুষ শ্রীভগবানকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। 'ঈশ' মানে নিয়ন্তা। আপনি হয়ত ভাবছেন আপনি নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন কিনা? এমন কেউ কি এই বিশ্বে রয়েছেন, যিনি নিয়ন্ত্রণে নেই? কেউ-ই এরূপ

দাবি করতে পারেন না। কিন্তু এই পরম সত্যটি জানা সত্ত্বেও অনেকেই নির্বোধের মতন বলে থাকে, "আমি কারও নিয়ন্ত্রণাধীন নই, আমি স্বাধীন, আমিই ভগবান"। যেমন মায়াবাদী দার্শনিকরা দাবি করে যে, "আমি ভগবান, আপনি ভগবান, প্রত্যেকেই ভগবান।" তারা ভুলে যায় যে তারা কারও নিয়ন্ত্রণাধীনে আছে। শ্রীভগবানই পরম নিয়ন্তা। ভগবানকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাই সহজেই এর থেকে বোঝা যায়, কেউ যদি কারও নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে সে কখনই ভগবান হতে পারে না। মায়াবাদী দার্শনিকদের এই সব বক্তব্য শূন্য আস্ফালন ছাড়া আর কিছু নয়।

এখানে আরেকটি কথাও বলার আছে। কিছু ভণ্ড দাবি করে যে তারা কারও নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আমি এমন একজন ভণ্ডকে জানি যে একটা সমিতি খুলেছে, আর প্রচার করছে যে "আমিই ভগবান"। একদিন দেখলাম, সে দাঁতের ব্যথায় কাতরাচ্ছে। আমি তাকে বললাম, "তুমি তো নিজেকে পরম নিয়ন্তা শ্রীভগবান বলে দাবি কর, তাহলে এখন দাঁতের ব্যথায় কাতরাচ্ছ কেন?" তুমি কি রকমের ভগবান হে? সেরকমই যদি আপনি দেখেন যে, কেউ নিজেকে ভগবান বলে জাহির করছে, তাহলে বুঝবেন সে এক নম্বরের ভণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। তবে একথাও ঠিক, জীবমাত্রেই কিছু না কিছুর নিয়ন্তা। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জীবমাত্রেই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির অভিপ্রকাশ। কারণ তাদের চেতনা রয়েছে। যা জড়া প্রকৃতির মধ্যে নেই। এজন্য জীব জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মাটি, জল, আগুন আর বাতাস থেকেই আমরা মন্দির গড়বার যাবতীয় উপকরণ পাই। আসলে ব্যাপারটি হল জীব অর্থাৎ মানুষ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার জন্য জড়াশক্তিকে রূপান্তরিত করে এইসব উপকরণ গড়ে তুলেছে। আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি, ইউরোপ থেকে লোক আসার আগে আমেরিকা ছিল পুরোপুরি শূন্য। যারা ওখানে বাস করত তারা দেশটাকে পুরোপুরি কাজে লাগায়নি। কিন্ত ইউরোপীয়ানরা এসে আমেরিকাতে বড় বড় শিল্প বাণিজ্য ও পথ-ঘাট গড়ে তুলে সেটিকে একটি বড় দেশে পরিণত করল।

এইভাবেই শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে জীবগণ জড়াশক্তির ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই কথাটি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/৫) বলেছেন—*যয়েদং ধার্যতে জগৎ*। এই সব জীবসত্তার অবস্থানের ফলে জড় জগতের গুরুত্বও প্রকাশ পেয়েছে। যেকোনও বড় শহর যেমন লস্ এঞ্জেলেস, নিউইয়র্ক, বা লণ্ডনের গুরুত্ব ততদিনই থাকবে যতদিন সেখানে জীবসত্তা থাকবে। তাই জড় বস্তর থেকে আত্মা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু

সমস্ত জড় সামগ্রীকে নিছক ইন্দ্রিয় উপভোগের উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়ে আত্মার গুরুত্ব তথা মর্যাদার অপব্যবহার করা হচ্ছে। আর এটিই হল বদ্ধ জীবনের লক্ষণ। আমরা ভুলে যাই যে, জড় বস্তুর থেকে উন্নত হলেও আমরা শ্রীভগবানের অধীন।

আধুনিক সভ্য মানুষ ভগবানকে পরোয়াই করে না। কারণ তারা জড় বস্তুর চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়েই মত্ত থাকে। তাই তারা কেবল বিভিন্ন উপায়ে জড়া প্রকৃতিকে শোষণ ও আত্মসাৎ করার চেষ্টাতেই নিজেদের ব্যস্ত রাখে। তারা ভুলে যায় যে যেকোনও মানুষ, তা সে আমেরিকান, রাশিয়ান, চীনা অথবা ভারতীয় যাই হোক না কেন—সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের অধীন। কিন্তু তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যায়। এই জড় জগৎকে তারা কেবল উপভোগের জায়গা বলেই মনে করে। এটাই তাদের রোগ।

এজন্য ভগবানের ভক্তদের কর্তব্য হল এইসব মানুষের মনে কৃষ্ণভাবনামৃত জাগিয়ে তোলা। ভক্তরা তাদের বোঝাবেন, "আপনারা জড় বস্তু অপেক্ষা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধীন। এজন্য জড় বস্তুকে কবেলমাত্র নিজেদের উপভোগের কাজে লাগানোই আপনাদের উচিত নয়। বরং সেগুলোকে শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে নিবেদন করাই আপনাদের পরম কর্তব্য।" যেমন ধরুন, ভক্তরা মন্দিরকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলে। সেটি কেবল তাদের সন্তুষ্টির জন্য নয়, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধানের জন্য।

ভক্ত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তফাৎ কোথায়? তফাৎটা হল এখানেই যে, সাধারণ মানুষ নিজের বাড়ি সুন্দর করে সাজায়, আর অন্যদিকে, ভগবানের ভক্তরা মন্দিরকে নিখুতভাবে সাজায়—দুটি ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ভিন্ন। সাধারণ মানুষ কাজ করে কেবলমাত্র নিজেদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। কিন্তু ভক্তরা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য।

আপনি নিজের ঘরবাড়িই সাজান বা ভগবানের মন্দিরই সাজান, দুটি ক্ষেত্রেই আপনি জড়া প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করছেন। কেননা এক্ষেত্রে যেকোনও উদ্দেশ্যে জড়াপ্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুকে কাজে লাগানো হচ্ছে। তবে যখনই আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য নিজের বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করবেন, তখনই আপনার জীবন হবে সার্থক। আর যদি শুধু নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য বুদ্ধিমত্তাকে প্রয়োগ করেন তবে আপনি জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়বেন। সেইসাথে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ভোগ করবেন। একই সঙ্গে একটার পর একটা দেহ আপনাকে পরিবর্তন করে যেতে হবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অপরা ও পরা প্রকৃতির পরম নিয়ন্তা। আমরা শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট শক্তি কারণ আমরা জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। তবে সেই

নিয়ন্ত্রণ কিন্তু শর্তাধীন। জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আমাদের সীমিত। আবার আমাদেরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই যা কিছু আমরা নিয়ন্ত্রণ করি তার ওপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবশ্যই অনুমোদন রয়েছে। যেমন ধরুন একজন নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে মাইক্রোফোনের মতন সুন্দর জিনিস বানাচ্ছে। এর অর্থ হল, সে তার কোনও বাসনা চরিতার্থ করার জন্য জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে কাজে লাগিয়ে এই জিনিসটি তৈরি করেছে। কিন্তু তার এই বুদ্ধি এল কোথা থেকে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাকে এই উন্নত বুদ্ধি প্রদান করেছেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*— "আমি সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতির সৃষ্টি।" এর থেকে সহজেই বোঝা যায় পরম নিয়ন্তা শ্রীভগবানই উৎকৃষ্ট শক্তিরূপে মানুষের মধ্যে বুদ্ধি প্রদান করেন। 'এটা করো, এখন ওটা করে .... ।" এই নির্দেশাবলী কখনই কিন্তু খেয়ালখুশী মতন হয় না। সেই মানুষটি তার পূর্ব জন্মে হয়ত কিছু করতে চেয়েছিল, কিন্তু এই জীবনে সে তা ভুলে গিয়েছে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে মনে করিয়ে দেন, "তুমি এটা করতে চেয়েছিলে। এখন সেই সুযোগ রয়েছে।" তাই আপনার হয়ত উন্নত বুদ্ধি রয়েছে, কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে উপযুক্ত বুদ্ধি দিলেই আপনি মাইক্রোফোনের মতন সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পারবেন। অন্যথায় আপনি কিছুই পারবেন না। এইভাবে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রেও আমরা শ্রীকৃষ্ণর এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেখে থাকি। যেমন, অনেক বড় বড় গ্রহ রয়েছে, সেখানে আমাদের পৃথিবী একটি ক্ষুদ্র গ্রহ মাত্র। তা সত্ত্বেও এই পৃথিবীতেই রয়েছে আটলান্টিক বা প্রশান্ত মহাসাগরের মতো সুবিশাল মহাসাগর, রয়েছে বিশাল বিশাল পর্বতমালা, আকাশছোঁয়া বাড়ি। কিন্তু এত সব ভার সত্ত্বেও পৃথিবীটা যেন এক টুকরো তুলোর মতো বাতাসে ভাসছে। কে একে ভাসাচ্ছে? এক কণা বালিকে কি কেউ ভাসিয়ে রাখতে পারে? আপনারা হয়ত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতো বিভিন্ন তত্ত্বকথা বলবেন। কিন্তু আপনিও তাকে অতিক্রম করতে পারবেন না। উড়োজাহাজও তো আকাশে ভেসে চলে, কিন্তু পেট্রল ফুরিয়ে গেলে তা কিন্তু তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়বে।

এত বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা এমন একটি বিমান তৈরি করেছেন, যা কিনা কিছুক্ষণ আকাশে ভেসে থাকতে পারে। তা হলে এই বিশাল পৃথিবীকে কি তারা অবিরাম আকাশে ভাসিয়ে রাখতে পারবেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৩)

সংশ্লিষ্ট ব্যাপার না থাকে। তার মধ্যে যেন এরূপ মনোভাব না থাকে যে—হে ভগবান, আমি তোমায় ভালবাসি কারণ তুমি আমায় অনেক ভাল-ভাল জিনিস দাও। তুমি আমার প্রয়োজন ও আদেশ মতন যাবতীয় জিনিস সরবরাহ কর। ভগবানের প্রতি আমাদের ভালবাসার প্রকৃতি কখনই যেন এরূপ না হয়। সেটি যেন কখনই আদান প্রদানের ওপর নির্ভর না করে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিখিয়েছিলেন, "হে ভগবান, আপনি আমাকে পদপিষ্ট করুন বা আলিঙ্গন করুন বা দর্শন না দিয়ে আপনি আমায় ব্যথা দিতে পারেন। আপনার যা অভিরুচি, তাই আপনি করতে পারেন। কারণ আপনিই আমার একমাত্র প্রাণনাথ।" এটিই হল ভগবানের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা। আমাদের মনে রাখতে হবে ভগবান তাঁর অভিরুচি অনুযায়ী যেকোনও কিছু করতে পারেন। তা সত্ত্বেও ভগবানকে ভালবাসব। ভালবাসার বিনিময়ে কোনও কিছু তাঁর কাছ থেকে পেতে চাই না। ভক্তদের কাছ থেকে ভগবান এরূপ ভালবাসাই পেতে চান। গোপিকারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ঠিক এইভাবেই ভালবেসেছিলেন। তাদের সেই ভালবাসায় কোন শর্ত ছিল না। তাদের ভালবাসা ছিল বিশুদ্ধ, অমলিন ও পবিত্র। তাই তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাদের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েছিলেন।

আপনিও যদি ভগবানকে এভাবে ভালবাসতে পারেন, তাহলে পৃথিবীর কোনও কিছুই আপনার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। শুধু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনার আকুলতাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আর সেটুকুই যথেষ্ট। তবেই যে কোনও পরিস্থিতিতে আপনার কৃষ্ণপ্রেম বিকশিত হতে থাকবে। কিন্তু ভাববেন না যে শ্রীকৃষ্ণ নিজের কল্যাণের জন্য আপনার ভালবাসা পেতে চান। জানবেন, এতে শুধু আপনারই কল্যাণ সাধিত হবে। কারণ কেবল এতেই আপনি প্রকৃত সুখী হবেন ও তৃপ্তি বোধ করবেন।

ভগবান এবং তাঁর শক্তিরাশি

ইশোপনিষদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, জীব বা নির্জীব, যে কোনও সত্তাকেই আমরা দেখি না কেন, সবাই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) একই কথা বলেছেন যে তাঁরই শক্তির মাধ্যমে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। *বিষ্ণুপুরাণে* সুনিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে যে—*একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা*- অর্থাৎ একই জায়গায় অবস্থিত অগ্নির দ্বারা যেমন চারদিকে উত্তাপ ও আলো বিচ্ছুরিত হয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের পরম শক্তির দ্বারাই জগতের সবকিছু সৃষ্টি হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সূর্য এক জায়গাতেই রয়েছে, কিন্তু সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই তার তাপ ও আলো বিতরতি

হচ্ছে। ঠিক তেমনই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমেই সব কিছুর সৃষ্টি করে চলেছেন।

এই আধ্যাত্মিক শক্তি সাময়িকভাবে জড় জগতের মধ্যে অবস্থান করছে। কিন্তু এটি জড়া শক্তির দ্বারা পরিবৃত হয়ে রয়েছে। যেমন, সূর্য প্রতিনিয়ত আকাশে রয়েছে। কেউই সূর্যকে তার কিরণ বিতরণ থেকে রোধ করতে পারে না। কিন্তু কখনও কখনও সূর্য মেঘ দ্বারা পরিবৃত হয়ে যায়। যখন এটি হয়, সেইসময় সেই নির্দিষ্ট অংশে সাময়িকভাবে সূর্যকিরণ আসতে পারে না। কিন্তু সূর্যের এই পরিবৃত অবস্থা সাময়িক। মেঘ সমস্ত সূর্যকিরণকে একসাথে পরিবৃত করতে পারে না। অর্থাৎ সূর্যের অতি ক্ষুদ্র অংশই সাময়িকভাবে মেঘ দ্বারা আবৃত হয়। একই ভাবে এই জড় জগৎ আধ্যাত্মিক জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ যা জড়া শক্তি দ্বারা সাময়িকভাবে আবৃত হয়ে রয়েছে।

আর জড়া শক্তি কি? জড়া শক্তি আধ্যাত্মিক শক্তিরই আর এক রূপ। যখন আধ্যাত্মিক ক্রিয়া অনুপস্থিত থাকে তখনই জড়া শক্তির প্রকাশ ঘটে। এখানেও সূর্য ও মেঘের সেই উপমা দেওয়া যায়। মেঘ প্রকৃতপক্ষে কি? এটি তো সূর্যকিরণেরই প্রতিক্রিয়া মাত্র। সূর্যকিরণ সমুদ্রের জলকে বাষ্পীভূত করে। সেই বাষ্পই মেঘের আকার নেয়। সুতরাং, সূর্যকিরণের ফলেই মেঘ সৃষ্টি হয়। একইভাবে, পরমেশ্বর ভগবানই জড়া শক্তির কারণ। আর সেই জড়া শক্তির আবরণের ফলেই আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি না।

এইভাবে জড়জগতে দুই ধরনের শক্তি বিরাজ করছে ঃ জড়া শক্তি ও পরা শক্তি। জড়া শক্তি আটটি জড় জাগতিক উপাদানে গঠিত। সেগুলি হল মাটি, জল, আগুন, বাতাস, আকাশ, বুদ্ধি, মন ও অহংকার। এইগুলি স্থূল অবস্থা থেকে ক্রমে সূক্ষ্ম অবস্থায় বোঝান হয়েছে। যেমন জল পৃথিবীর থেকে সূক্ষ্ম, আবার আগুন জলের থেকে সূক্ষ্ম, ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা গেল উপাদান যতই সূক্ষ্ম হয়, ততই তার ক্ষমতা বাড়তে থাকে। যেমন ধরুন, মনের গতি নিয়ে আপনি মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করতে পারবেন। কিন্তু মনের থেকে আরও বেশী শক্তিশালী হল বুদ্ধি আর বুদ্ধির থেকে আরও বেশী শক্তিসম্পন্ন পরা শক্তি। পরা শক্তি কি? *ভগবদ্গীতায়* (৭/৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ জীবভূতাম্*। অর্থাৎ নিকৃষ্ট জড়া শক্তি ছাড়াও আমার আর একটি উৎকৃষ্ট শক্তি রয়েছে। সেটি হল পরা শক্তি। এর থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হচ্ছে।

আমরা জীবগণও শক্তি, কিন্তু উৎকৃষ্ট শক্তি। কিভাবে আমরা উৎকৃষ্ট? কারণ আমরা জড়া শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। জড় বস্তুর নিজস্ব কোনও শক্তিই

নেই। যেমন বিশাল বিশাল বিমানগুলো সুন্দরভাবে আকাশে ওড়ে, কিন্তু পরা শক্তি—বিমানচালক— সেখানে থাকে। বিমানচালক না থাকলে বিমান কিছুতেই উড়তে পারে না। যদি না পরা শক্তির অতি ক্ষুদ্র অংশ, বিমানচালক বিমানকে স্পর্শ না করে তবে হাজার হাজার বছর ধরে জেট প্লেন বিমানবন্দরে বসে থাকবে। তাহলে ভগবানকে উপলব্ধি করতে অসুবিধা কোথায়? যেখানে এত বিশাল বিশাল যন্ত্রপাতি পরা শক্তি তথা কোনও জীবের স্পর্শ ছাড়া নড়তেই পারে না, সেখানে কিভাবে আপনি তর্ক করেন যে এত সব জড়া শক্তিরাশি কোন রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আপনা আপনিই কাজ করছে? নির্বোধরাই এরূপ তর্ক করে। তাই যারা বুঝতে পারে না যে, এই জড়া প্রকৃতিকে কীভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন তারা অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন। আর যেসব ভগবৎ বিদ্বেষী মানুষ মনে করে যে জগৎ আপনা আপনিই চলছে তারা নির্বোধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, "জগতের স্থাবর এবং জঙ্গম অর্থাৎ অচেতন এবং চেতন সত্তা, সবকিছুই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সৃষ্টি ও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই পরম নিয়ন্তা ও সর্বময় কর্তা। আমাদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতায় দেখি যে কোনও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই মালিক। ঠিক তেমনই পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু এই জড়জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাই তিনিই এর অধিপতি। এর অর্থ হল যে যতটা সম্ভব সবকিছু ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে।

তাহলে আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মিটবে কিভাবে? এই বিষয়ে *ঈশোপনিষদে* ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "একজন ততটুকুই প্রয়োজন মতন গ্রহণ করবে যতটুকু তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, এবং অন্যের জন্য বরাদ্দ কোন কিছুই গ্রহণ করা উচিত নয়।" কৃষ্ণভাবনামৃত বলতে বোঝায় এমন একটি ভাবধারা, যার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি বিষয়কে উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং যদি আমরা এই মূলনীতিগুলো বুঝতে পারি তবেই আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে সক্ষম হব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মর্যাদা

শ্রীঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, "পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর পরমধামে অবস্থান করলেও তিনি মনের গতির চেয়েও দ্রুততর গতিতে সকলকে অতিক্রম করতে পারেন। শক্তিমান দেবগণও তাঁর সম্মুখীন হতে পারেন না। একস্থানে অবস্থান করলেও, তিনি বায়ু ও বৃষ্টির দেবতাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। সর্ব

বিষয়েই তিনি শ্রেষ্ঠতার বিচারে অপরাজেয় থাকেন।" *ব্রহ্মসংহিতাতেও* একই কথা বলা হয়েছে— *গোলোক এব নিবসত্যাখিলাত্মভূত*"। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজ করলেও সকল জীবের অন্তরে তিনি অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণকে কোন কর্তব্যকর্ম সাধন করতে হয় না। তিনি শুধু তাঁর পারিষদদের অর্থাৎ গোপী, গোপসখা, তাঁর মাতা, পিতা ও নিজের গাভী ও বাছুরদের নিয়ে আনন্দ উপভোগ করেন। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর তাঁর বন্ধুরা আরও বেশী স্বাধীন। যখনই তারা কোনও বিপদের সম্মুখনি হত, তারা নিশ্চিন্ত থাকত এই ভেবে যে শ্রীকৃষ্ণ তাদের রক্ষা করবেন। এজন্য তারা কোনও দুঃচিন্তাই করত না। যদিও বন্ধুরা বিপদে পড়লে শ্রীকৃষ্ণ খানিকটা উদ্বেগ অনুভব করতেন। কিন্তু তার বন্ধুরা মনে করত, "এই তো শ্রীকৃষ্ণ এখানে রয়েছেন। তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন।" পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতবর্ষের বৃন্দাবনে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলাবিলাস করতেন সেই সময় প্রতিদিনই তিনি তার গোপসখা, গাভী ও বাছুরদের নিয়ে যমুনার তীরে খেলতে যেতেন। আর সেই সময় প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সখাদের বধ করার জন্য কংস কোনও কোনও দানবকে পাঠাত। তা সত্ত্বেও গোপ বালকরা নির্ভয়ে খেলত, কারণ তারা নিশ্চিতভাবে জানত সবকিছু শ্রীকৃষ্ণ তাদের অবশ্যই রক্ষা করবেন। আর এটিই হল আধ্যাত্মিক জীবনের বৈশিষ্ট্য। যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই প্রত্যেকের নিশ্চিত জীবনের সূচনা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণের অর্থ হল তাঁর প্রতি একান্ত বিশ্বাস রাখা, যে কোনরকম বিপদের সময়ে তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন। আর এই আত্মসমর্পণের প্রথম পদক্ষেপই হল শুধুমাত্র ভক্তিমূলক ক্রিয়াকলাপ করা। সেইসাথে ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল ক্রিয়াকলাপগুলো বর্জন করা। এর পরবর্তী পদক্ষেপ হল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মনে মনে আস্থা অর্জন করা যে কোনরকম বিপদে কেবলমাত্র তিনিই আমাদের উদ্ধার করবেন। প্রকৃতপক্ষে বাস্তব সত্য হল যে তিনি সবসময়ই আমাদের রক্ষা ও প্রতিপালন করে চলেছেন। কিন্তু মায়ার (বিভ্রান্তি) কারণে আমরা মনে করে থাকি যে আমরা বুঝি খাদ্য সংগ্রহ ও গ্রহণের মাধ্যমে নিজেরাই নিজেদের প্রতিপালন করছি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভক্তদের প্রতিপালন করেন এবং তাদের জীবন সুরক্ষিত করেন। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি অর্থাৎ মায়াদেবী অন্য সব সাধারণ জীবদের প্রতিপালন করেন। এই মায়াদেবীই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ রূপে বদ্ধ জীবদের তাদের ত্রুটিপূর্ণ কার্যকলাপের জন্য শাস্তি দেন। যেকোনও দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার

আমরা যেমন দেখি, সুনাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকার সরাসরি সুব্যবস্থা করেন, অন্যদিকে দুষ্কৃতীদের কারাবিভাগের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কারারুদ্ধ দুষ্কৃতীদের জন্যও সরকার উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করেন, অসুস্থ হলে তাদের জন্য হাসপাতালে সুচিকিৎসার বন্দোবস্তও করা হয়। কিন্তু পুরোটাই করা হয় কারাগারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাধীনে। একইভাবে, এই জড় জগতে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুব্যবস্থা করে রেখেছেন। সেই সাথে আমাদের জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থাও করা আছে। যেমন, যদি আপনি এই পাপ কাজটি করেন, তবে আপনি চড় খাবেন। আবার অন্য একটি পাপ কাজের জন্য লাথি খাবেন। এইভাবে বিভিন্ন পাপ কাজের জন্য বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আর এই শাস্তি দেওয়া হয় তিন ধরনের দুঃখ-দুর্দশা ভোগের মাধ্যমে—সেগুলো হয় প্রথমত শারীরিক বা মানসিক কষ্ট ভোগের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত অন্যান্য জীবকুলের মাধ্যমে এবং তৃতীয়ত দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবন ধারাকে বিঘ্নিত করে। আমরা একথা বুঝতে পারি যে, পাপকর্মের জন্য মায়া আমাদের শাস্তি দিয়ে চলেছে, তা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশত আমরা মনে করে থাকি যে কেবল দুর্ঘটনাবশত আমরা এই সব লাথি, চড়, পিটুনি খেয়ে চলেছি। এটাই মায়ার প্রভাব।

কিন্তু যখনই আপনি কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন করবেন, তখনই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আপনার জীবনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবেন। যেরকম তিনি *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৬৬) আশ্বাস দিয়েছেন, "আমি তোমাকে দেখাশোনা করব। তোমার সমস্ত পাপ থেকে অবশ্যই তোমাকে রক্ষা করব। কোনও দুশ্চিন্তা করো না।" এই জড় জগতে আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে জন্মগ্রহণ করে জীবন ধারণ করেছি। সেইসাথে বিভিন্ন পাপ কাজে ব্রতী হয়েছি। তার ফলস্বরূপ জন্ম জন্মান্তরে কষ্ট পেয়ে চলেছি। কিন্তু যে মুহূর্তে কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে, তক্ষুণি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দায়িত্ব নেন এবং সবরকম পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "দুশ্চিন্তা করো না।" চিন্তা করো না এই ভেবে যে "আমি তো কতরকম পাপ করেছি। শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কিভাবে রক্ষা করবেন?" মনে রাখবেন শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান। তিনিই শুধু আপনাকে রক্ষা করতে পারবেন। আপনার কর্তব্য হল, সব কিছু ভুলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করা। বিনা দ্বিধায় তাঁরই প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর সেবা করা। তাহলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে আপনাকে সকল প্রকার সঙ্কট থেকে রক্ষা করবেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব

ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, "পরমেশ্বর ভগবান সচল এবং অচল। তিনি বহু দূরে নাগালের বাইরে বিরাজমান, তবু তিনি আমাদের কাছেই রয়েছেন। তিনি সব কিছুর মাঝেই অবস্থান করেন, তা সত্ত্বেও তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর বাইরেও বিরাজ করছেন।" কিভাবে কৃষ্ণ সচল এবং অচল। একটি খুব সাধারণ উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে। ভরদুপুরে সূর্য যখন আমাদের মাথার ওপর উঠে আসে সেই সময় হাঁটতে শুরু করলে দেখা যাবে, সূর্যও আমাদের সঙ্গে চলেছে। চল্লিশ বছর আগে, আমি যখন গৃহস্থ ছিলাম, তখন একদিন সন্ধ্যেবেলা আমার মেজো ছেলেকে নিয়ে হাঁটছিলাম। তখন ওর বয়স মাত্র চার। হঠাৎ সে বলল, "বাবা, চাঁদটা কেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে?" তাহলে ব্যাপারটা দেখলেন তো? চাঁদ আর সূর্য আকাশে স্থির হয়ে রয়েছে। তবু মনে হচ্ছে ওরা আমাদের সাথে সাথে চলেছে। একইভাবে লক্ষ্য করবেন, বিমান বা ট্রেনে চেপে কোথাও গেলে মনে হবে চাঁদ ও সূর্যও আমাদের সাথে চলেছে। ঠিক একইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও আমাদের সাথেই নিয়ত বিরাজ করেন। অর্থাৎ যদিও তিনি বহু দূরে বিরাজমান, তবুও তিনি আমাদের খুব কাছেই রয়েছেন। অন্যভাবে বলা যায়, যদিও গোলোক বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের সাথে লীলাবিলাস উপভোগ করছেন, তবুও সেই সঙ্গে তিনি বিশ্বজগতের সর্বত্র বিরাজমান। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একইসাথে "সচল এবং অচল"।

যদি ভগাবন শ্রীকৃষ্ণ এখানে অথবা গোলোকধামে বিরাজ না করতেন, তাহলে তাঁর উদ্দেশ্যে ভক্তদের নিবেদিত ভোগ তিনি কেমন করে গ্রহণ করতেন? এটা কখনই ভাববেন না যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তবৃন্দের নিবেদন গ্রহণ করেন না। ভক্তিভরে যদি কেউ তাঁকে কিছু নিবেদন করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তিনি দুই বাহু বাড়িয়ে তা গ্রহণ করেন। *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি*—অর্থাৎ "ভক্তি সহকারে ভক্ত আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করলে আমি তা গ্রহণ করি।" কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, "শ্রীকৃষ্ণ তো বহুদূরে গোলোক বৃন্দাবনে রয়েছেন। তাহলে কিভাবে তিনি আপনার নৈবেদ্য গ্রহণ করেন?" উত্তর হল, অবশ্যই তিনি তা গ্রহণ করেন। তিনি তা আহারও করেন—তবে অবশ্যই যেন সেটি প্রেমভক্তি সহকারে নিবেদন করা হয়।

এর থেকে সহজেই বোঝা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র বিরাজমান। তিনি যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থানে প্রকাশিত হতে পারেন, কিন্তু তাঁকে আহ্বান করার মতন যোগ্যতা অবশ্যই আপনার থাকতে হবে। যদি আপনি প্রকৃতই একজন

ভক্ত হন, তেব যে কোন মুহূর্তে আপনাকে রক্ষা করার জন্য শ্রীভগবান প্রকাশিত হতে পারেন। যেমনটি হয়েছিল প্রহ্লাদ মহারাজের ক্ষেত্রে। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তার পুত্র ভগবানের পরম ভক্ত প্রহ্লাদকে তাচ্ছিল্যের সাথে বলেছিল, "কোথায় তোমার ভগবান? তুমি বলছ, ভগবান সবখানেই আছে। তাহলে আমার প্রাসাদের এই স্তম্ভের মধ্যেও আছে কি? তুমি মনে করছ যে তোমার ভগবান ওখানে আছে? বেশ, তবে আমি তাকে এখন বধ করব।"

তক্ষুণি হিরণ্যকশিপু প্রাসাদের স্তম্ভটি ভেঙে ফেলেছিল। আর তখনই স্তম্ভ থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্ধেক নর এবং অর্ধেক সিংহ অর্থাৎ নৃসিংহ রূপে বেরিয়ে এসে দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এরকমই।

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেকোনও স্থানেই আবির্ভূত হতে পারেন। কারণ তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন। *ঈশোপনিষদে* এটিই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে " *তদন্তরস্য সর্বস্য তদ্‌ সর্বস্যাস্য বাহ্যত"*— "পরমেশ্বর ভগবান সবকিছুরই অন্তরে রয়েছেন। তবুও তিনি সবকিছুর বাইরে বিরাজ করছেন"। এই বৈদিক মন্ত্রটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীভগবান সর্বত্রই বিরাজমান। বেদে যা কিছু বলা হয়েছে তা সবই বাস্তব সত্য। স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে বেদকে গ্রহণ না করলে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন করা সম্ভব হবে না। যেমন গণিত শাস্ত্রেও অনেক স্বতঃসিদ্ধ সত্য রয়েছে—একটি বিন্দুর কোনও দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ থাকে না, পরস্পর সমধর্মী দুটি বস্তুর একটি অন্যটির সমান হয় ইত্যাদি। এইগুলো হল স্বতঃসিদ্ধ সত্য। গণিত শিখতে হলে এগুলোকে আমাদের মেনে নিতে হবে। সেরকমই বৈদিক শাস্ত্রেও কিছু স্বতঃসিদ্ধ সত্য রয়েছে। পরমার্থিক উন্নতি লাভ করতে হলে আমাদের বৈদিক শাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলোকে মেনে নিতে হবে।

কখনও কখনও বেদে দেখা যায় কিছু পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব রয়েছে। তা সত্ত্বেও বৈদিক অনুশাসন আমাদের মেনে নিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৈদিক অনুশাসন মেনে আপনি প্রাণীর অস্থি স্পর্শ করলে অশুদ্ধ হয়ে যাবেন। তাই তৎক্ষণাৎ আপনাকে স্নান করতে হবে। এখন শঙ্খ একটি প্রাণীর অস্থি। কিন্তু ঠাকুর ঘরে তা ব্যবহার করা হয়। আপনি এখানে কোন তর্ক করতে পারবেন না। আপনাকে মেনে নিতেই হবে যে প্রাণীর অস্থি অশুদ্ধ হলেও শঙ্খ শুদ্ধ। যার ফলে এটি ঠাকুর ঘরে রাখা চলে।

ঠিক এভাবেই আপনাকে পারমার্থিক গুরুদেবের নির্দেশ স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিতে হবে। সেখানে কোন কর্ত বিতর্ক চলতে পারে না। তাহলেই আপনার পারমার্থিক উন্নতি সম্ভব। আপনার কাছে বোধগম্য নয় এমন বিষয়ও আপনাকে মানতে হবে। নইলে আপনি ব্যর্থ হবেন। অর্থাৎ বৈদিক অনুশাসন ও পারমার্থিক গুরুর আদেশ আপনাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলেই মানতে হবে। এটা কোনও গোঁড়ামি নয়। আমাদের পূর্বতন পারমার্থিক গুরুবর্গও এই নীতি মেনে চলেছিলেন। আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল গুরুদেবের সাথে তর্ক করে আপনি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন না। কারণ তর্ক বিতর্ক চলতেই থাকে। তা থেকে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তাই এটি কোনও পদ্ধতিই নয়।

মহাভারতে বলা হয়েছে, *তর্কোঽপ্রতিষ্ঠ" শ্রুতয়ো বিভিন্না*-শুধুমাত্র তর্ক বিতর্ক করে কোন সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বিভিন্ন দেশ আর পরিস্থিতিতে শাস্ত্র ভেদও বিভিন্ন। *নাসাবৃষির্যস্যমতং ন ভিন্নম্*—দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে বলা যায়—কোনও এক দার্শনিক একরকম তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন আবার আরেকজন দার্শনিক আরেক রকম তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন। এইভাবে বিভিন্ন তত্ত্ব কথার মধ্যে সব সময়ই পারস্পরিক বিরোধিতা তৈরি হয়। এক দার্শনিককে পরাজিত না করে আরেকজন বিখ্যাত হতে পারেন না। এটাই দর্শনের নিয়ম। তাহলে মানুষ কিভাবে দার্শনিক সত্যের চরম সিদ্ধান্ত শিখবে? এইজন্য বলা হয়— *ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্*। অর্থাৎ ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রক্রিয়ার প্রকৃত গূঢ় তত্ত্ব রয়েছে কেবলমাত্র আত্মজ্ঞান সম্পন্ন শুদ্ধাত্মা মানুষের অন্তরে। তাহলে কিভাবে সেটি উপলব্ধি করা যাবে? *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"*-অর্থাৎ মহান পারমর্থিক ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। এইজন্য আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। এজন্য আপন্যকেও বৈদিক শাস্ত্রের অনুশাসন ও সদ্‌গুরুর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। তবেই আপনার সার্থকতা সুনিশ্চিত হবে।

ভগবান এবং তাঁর শক্তি—এক এবং ভিন্নও

ঈশোপনিষদে বলা হয়ছে, "যিনি সকল জীবের মধ্যেই আত্মার স্ফুলিঙ্গ রয়েছে বলে উপলব্ধি করতে পারেন এবং সেইজন্য ভগবানের সাথে সমস্ত জীবকে এক মনে করতে পারেন, তিনিই সর্বজ্ঞ বলে বিবেচিত হন। তখন তার কাছে কোন কিছুই কি উদ্বিগ্নতা বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে?" এইরূপ উপলব্ধিই হল কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সুফল। মানুষের বিভিন্ন প্রকার উপলব্ধি হয়, কিন্তু যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি পরম সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেন। সেটি হল গুণগতভাবে আমরা সকলেই ভগবানের সাথে একাত্ম পরিচয় সম্পন্ন জীব, কিন্তু পরিমাণগতভাবে আমরা তাঁর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। দার্শনিকরা মনে করে আমরা

বুঝি ভগবানের সাথে পরিপূর্ণভাবে এক, অথবা পরমতত্ত্ব ও আমরা অভিন্ন। কিন্তু এটা সত্য নয়। আমরা যদি ভগবানের সাথে পরিপূর্ণভাবে এক হতাম, তাহলে কি-ভাবে আমরা মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত হতাম? দার্শনিকরা কিন্তু এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে না।

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সাথে আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি তা বৈদিক শাস্ত্রে স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নির উপমা দিয়ে বিশ্লেষণ করা রয়েছে। অগ্নির স্ফুলিঙ্গগুলি অগ্নির মতনই গুণ সম্পন্ন, তবু পরিমাণ বিচারে সেগুলি অগ্নি অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক। যখন এই স্ফুলিঙ্গ অগ্নি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জলে পড়ে তখন তার অগ্নিময় গুণাবলী হারিয়ে যায়। ঠিক সেরকমই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আত্মাগুলি যখন ভগবানের থেকে বিচ্যুত হয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকারে পড়ে তখন তাদের আধ্যাত্মিক গুণাববলী অবলুপ্ত হয়। তবে স্ফুলিঙ্গ যদি জলের পরিবর্তে কোনও ভূমিতে পড়ে তবে তাঁর মধ্যে কিছুটা তাপ থাকে। সেরকমই, জীব যদি রজোগুণাশ্রিত অহম্‌বোধের মাঝে অবস্থান করে, তবে কিছুটা আশা থাকে যে তার অন্তরে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের প্রবৃত্তি আবার জাগ্রত হতে পারে। আবার যদি স্ফুলিঙ্গটি কোনও শুকনো ঘাসের ওপর পড়ে তবে তার থেকে অগ্নিময় গুণসম্পন্ন আর একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শুদ্ধভাবে এই জীবন যাপন করা উচিত। যিনি সত্ত্বগুণাশ্রিত হয়ে শুদ্ধভাবে জীবন যাপন করেন এবং আধ্যাত্মিক সঙ্গলাভের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন, তিনিই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পরম সুখ পুনরায় আস্বাদন করতে পারবেন।

আবার অগ্নির উপমার ম্যামে পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর শক্তিরাজীর ভেদ ও অভেদত্ব আমরা সহজেই বুঝতে পারব। যেখানেই অগ্নি, সেখানেই উত্তাপ ও আলো। উত্তাপ থেকে আলো বা অগ্নি কিন্তু পৃথক নয়। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও এইভাবেই বোঝা যেতে পারে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরাজি দ্বারা গঠিত, তাই কোনকিছুই শ্রীকৃষ্ণ থেকে পৃথক নয়। তা সত্ত্বেও, জড়জাগতিক সব কিছু থেকেই শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ পৃথক রয়েছেন। তাই যা কিছুই আমরা এই জড় জাগতিক বা চিন্ময় জগতে দেখে থাকি সেটি শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তিরাজির অভিপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন এই জড় জগতটি কেলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তির অভিপ্রকাশ মাত্র। আবার চিন্ময় জগৎটি হল অন্তরাঙ্গা শক্তির অভিপ্রকাশ মাত্র এবং আমরা জীবেরা তাঁর তটস্থা শক্তির অভিপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং আমরা হলাম শক্তি। তবে আমরা কিন্তু শক্তিমান নই।

মায়াবাদী দার্শনিকরা বলে যে, যেহেতু শক্তিসমূহ ব্রহ্মের বাইরের কোন কিছু নয়, তাই শক্তিসমূহ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন।

এটিই হল অদ্বৈতবাদ। আমাদের বৈষ্ণবীয় দর্শন বলে যে শক্তি যেমন শক্তিমানের সাথে অভিন্ন, তেমনি শক্তিমান হতে ভিন্নও। এক্ষেত্রে আবার দেওয়া যায় অগ্নি ও উত্তাপের উপমা। আপনি যখন উত্তাপ অনুভব করবেন তখন আপনি অবশ্যই জানবেন যে কাছাকাছি কোথাও আগুন আছে। কিন্তু তাই বলে এটি ঠিক নয় যে আপনি আগুনের মধ্যেই আছেন। এইজন্য উত্তাপ ও অগ্নি, অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান এইসাথে অভিন্ন আবর ভিন্নও।

সুতরাং মায়াবাদী দর্শনের অদ্বৈতবাদ এবং আমাদের বৈষ্ণবীয় দর্শনের অদ্বৈতবাদের মধ্যে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। মায়াবাদীরা বলে যে ব্রহ্ম সত্য, কিন্তু ব্রহ্ম থেকে যে শক্তিরাশি নির্গত হয়, তা মিথ্যা। কিন্তু আমরা বলি যে যেহেতু ব্রহ্ম সত্য সেহেতু তাঁর থেকে উদ্ভাসিত শক্তিরাশিও সত্য। এটিই মায়াবাদী দর্শনতত্ত্বের সাথে বৈষ্ণবীয় দর্শন-তত্ত্বের পার্থক্য। এই জড়জাগতিক শক্তি যদিও সাময়িক, কিন্তু কেউ দাবি করতে পারে না যে এটি মিথ্যা। মনে করুন আমাদের কিছু সমস্যা রয়েছে। দেহ, মন সহ বিভিন্ন বাহ্যিক কারণের দ্বারা সমস্যা তৈরি হতে পারে। এই সব সমস্যা আসে আবার চলেও যায়। যখন আমরা কোনও সমস্যার মধ্যে থাকি তখন সেটি বাস্তব সত্য। আমরা সেই সমস্যাগুলোকে উপলব্ধি করতে পারি। সেক্ষেত্রে বলতে পারি না যে এগুলো মিথ্যা। কিন্তু মায়াবাদী দার্শনিকরা বল যে এগুলো মিথ্যা। তাহলে তারা কেন সমস্যার মধ্যে পড়লে বিপর্যস্ত বোধ করে? শ্রীকৃষ্ণের কোনও শক্তিরাশিই মিথ্যা নয়।

ইশোপনিষদে 'বিজনাতঃ' শব্দটি ব্যাবাহর করা হয়েছে। এর অর্থ হল "যিনি জানেন—এর দ্বারা বোঝান হয় এমন এক ব্যক্তিকে যিনি উপলব্ধি করতে পারেন ভগবান এবং তাঁর শক্তিরাশির মধ্যে কি ভেদ ও অভেদ রয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তি 'বিজনাতঃ' না হন তবে তিনি মায়ার কবলে পড়ে দুর্ভোগ ভোগ করবেন। কিন্তু যিনি 'বিজনাতঃ' তার কাছে মায়া নেই, দুঃখ হতাশাও নেই। যখন আপনি প্রকৃতই অনুভব করবেন যে এই জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শক্তিরাশি ছাড়া অন্য কোনও কিছুই নেই, তখন কোনও মায়া মোহ, দুঃখ, কষ্ট আপনাকে স্পর্শ করতে পরবে না। একেই বলা হয় ব্রহ্মভূত স্তর। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৫৪) এটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *"ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচীত ন কাঙক্ষতি"* যার অর্থ যিনি চিন্ময় মনোভাব অবলম্বন করে থাকেন, তিনিই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি সর্বদা আনন্দে থাকেন এবং কোনকিছুর জন্য তিনি শোক করেন না বা কোনকিছুর আকাঙ্খা করেন না।

ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য আমরা এমন কিছু পাওয়ার চেষ্টা করি যা আমাদের নেই। সেটাই আমাদের লালসা। আর কোনও কিছু হারালেই আমরা শোক করি। কিন্তু যদি আমরা বুঝতে পারি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই জড় জাগতিক সব কিছুর উৎস ও সর্বময় কর্তা, তাহলেই আমরা বুঝতে পারব সবকিছুই তাঁর সম্পদ এবং যা কিছু আমরা পেয়েছি সবই তাঁর দান। তাঁর সেবার জন্যই আমাদের সেই সব জিনিস ব্যবহার করতে হবে। তাহলেই আর জগতের কোনও জিনিসের জন্য আমাদের কোনও লালসা থাকবে না। এরপরে যদি শ্রীকৃষ্ণ কোনও জিনিস আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেন তবে তার জন্য আমরা শোক করব কেন? আমাদের ভাবা উচিত, "স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমার কাছ থেকে এটি নিতে চেয়েছেন। সুতরাং তার জন্য আমি হা-হুতাশ করব কেন? পরমেশ্বর ভগবানই সবকিছুর কারণ। তিনি যেমন নেন, তেমনি তিনি দেনও"। যখন কেউ এইভাবে পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করবেন, তখন আর তার শোকের কোনও কারণ থাকবে না। যার ফলে তিনি আর লালসাগ্রস্তও হবেন না। আর এটিই হল প্রকৃত পারমার্থিক স্তর। এই পর্যায়ে উন্নীত হলেই আপনি জগতের সকলকে চিন্ময় শক্তির স্ফুলিঙ্গ রূপে, শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে এবং তাঁর সেবক রূপে দেখতে পাবেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম শুদ্ধ

ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, "ভগবান সর্ব বিষয়ে মহান্‌, তিনি কোনও শরীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদোষ মুক্ত, জড় প্রকৃতির নিয়মের ঊর্ধ্বে, তাঁর শরীর শিরা-উপশিরা, রক্তমাংসের গঠিত নয়, তিনি শুদ্ধ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ সত্তা।" কোনও রকম পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কখনও কখনও স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা শ্রীকৃষ্ণের সমালোচনা করে বলে থাকে, "কেন শ্রীকৃষ্ণ মধ্যরাতে পর-স্ত্রীদের সাথে রাসনৃত্য করেন?" শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। তিনি নিজের খুশি মতন যা কিছু করতে পারেন। আপনাদের বিধি নিষেধ তাঁর ওপর প্রযোজ্য নয়। এর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আটকানো সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন বিধিনিষেধ শৃঙ্খল থাকবে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই সব শৃঙ্খলের ঊর্ধ্বে। তিনি সকল প্রকার নিয়মকে অতিক্রম করতে পারেন।

পরীক্ষিৎ মহারাজও একই প্রশ্ন শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে করেছিলেন " "শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন ধর্ম ও নীতি প্রতিষ্ঠা করতে। তাহলে তিনি কেন এত পরস্ত্রীদের সঙ্গ উপভোগ করেন? এটি খুবই পাপকার্য বলে আমার মনে হয়।" শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তরে বলেছিলেন যে, কোনও পাপই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে

কলুষিত করতে পারে না, বরং যারা শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন, তাদের কলুষিত মন শুদ্ধ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে সূর্যের উদাহরণ দেওয়া যায়। সূর্য কখনও কলুষিত হতে পারে না। বরং কোনও কলুষিত পদার্থকে সূর্যকিরণে রেখে দিলে তা শোধিত হয়ে যায়। সেরকমই আপনারা কোনও রকম জড়-জাগতিক বাসনা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মনিবেদন করতে পারেন। তার ফলে আপনিই শুদ্ধ হবেন। তবে অবশ্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের মনোভাব জড়-জাগতিক কামনা-বাসনায় লিপ্ত ছিল না। তা সত্ত্বেও অল্প বয়সী বালিকাদের মতন তারা শ্রীকৃষ্ণের রূপে মোহিত হয়েছিল। নিজেদের প্রেমের স্বার্থেই তারা অন্তরের ভালবাসা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে অবৈধ প্রেমসঙ্গিনীদের মতো এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার ফলে তারা শুদ্ধতা অর্জন করেছিল। এমনকি দৈত্য-দানবরাও শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে শুদ্ধতা অর্জন করতে পারে। যেমন, কংস মনে করেছিল শ্রীকৃষ্ণ তার শত্রু। কিন্তু সে সর্বদা কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠেছিল। কারণ প্রতিনিয়তই সে ভাবত কৃষ্ণকে কেমন করে পাব? আমি তাকে বধ করব।" এটা ছিল তার আসুরিক মনোভাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে সে শুদ্ধ হয়ে মুক্তি লাভ করেছিল।

সুতরাং এর থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে যদি আমরা কোনওভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠতে পারি তাহলে তক্ষুনি আমাদের পাপপূর্ণ বাসনা শুদ্ধ হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সুযোগ প্রত্যেককেই দিয়েছেন।

শরীরের পরিসীমার ওপরে

ঈশোপনিষদে পরমেশ্বর ভগবানকে এইভবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "তিনি মহত্তম, কায়াহীন এবং পরম জ্ঞানী।" এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে শ্রীভগবান এবং আমাদের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ রয়েছে। আমরা কায়াবদ্ধ সত্তা। সেইজন্য আমি ও আমার শরীর-দুটি সম্পূর্ণ আলাদা। যখন আমি এই শরীর পরিত্যাগ করব তখন তা কেবল ছাই ভস্মে পরিণত হবে। যেমন বাইবেলে বলা হয়েছে, "তোমরা ধূলিকণা মাত্র, এবং ধূলিকণাতেই ফিরে আসবে"। কিন্তু আমি ধূলিকণা নই, আমি হলাম চিন্ময় আত্মা। সুতরাং তোমরা বলতে এখানে কেবলমাত্র শরীরটিকেই বোঝানো হয়েছে।

কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শরীরী সত্তায় আবদ্ধ নন। এর অর্থ হল তাঁর শরীর ও আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অন্যভাবে বলা যায় তাঁর শরীর হল শুদ্ধ চিন্ময় সত্তা। এইজন্য তিনি কখনও শরীর পরিবর্তন করেন না। আর যেহেতু তিনি শরীর পরিবর্তন করেন না, তাই তিনি সর্বব্যাপী—সর্ব বিষয়ে স্মৃতি সম্পন্ন।

অন্যদিকে যেহেতু আমাদের নশ্বর শরীরটির পরিবর্তন হয়ে যায়, সেহেতু আমরা আগের জন্মের কোন কথা স্মরণ করতে পারি না। আমরা ভুলে যাই আমরা কে। ঠিক যেমন ঘুমিয়ে পড়লে আমরা আমাদের শরীর ও চারদিকের পরিবেশের কথা ভুলে যাই। এই সময়টিতে আমাদের শরীর ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেয়। তার কোন সক্রিয়তা থাকে না। তার পরিবর্তে আমরা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করতে থাকি। সেই অন্য পরিবেশে আমরা অন্য একটি শরীর গড়ে তুলি। প্রায় প্রতি রাতেই এই ব্যাপারটি হয়। ফলে এর সাহায্যে আমরা শরীর ও আত্মার বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারব।

সেরকমই প্রতিটি জীবনেই আমরা বিভিন্ন রকম পরিবেশ সৃষ্টি করি। যেমন এই জীবনে 'আমি ভারতীয়' পরের জন্মে হয়ত একজন আমেরিকান হিসাবে জন্ম নিলাম। অথবা আমেরিকান হিসাবে জন্মালেও আমি মানুষ না হয়ে গরু বা ষাঁড় হয়ে জন্মালাম। তখন আমাকে হয়ত কসাইখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। আর সেই ভয়ঙ্কর অবস্থাটা আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন।

এখন সমস্যা হল, জন্মের পর জন্ম আমরা শুধু দেহ পরিবর্তন করে চলেছি। এটাই ভয়ংকর ব্যাপার। আমাদের কোনও নির্দিষ্ট অবস্থা নেই। আমরা কেউই জানি না ৮৪,০০,০০০ প্রজাতির মধ্যে পরের জন্মে আমরা কি হয়ে জন্মাব?

তবে এর একটা সমাধানও রয়েছে। যদি কোনওভাবে মানুষ তার অন্তরে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত জাগিয়ে তোলে তবে মৃত্যুর পর সে কৃষ্ণধামে চলে যায়। ফলে তখন তাকে আর কোনও জড় জাগতিক নশ্বর দেহ ধারণ করতে হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৎ, চিন্ময় ও চির আনন্দময় দিব্য শরীরের মতোই একটি সূক্ষ্ম চিন্ময় শরীর সে লাভ করে।

এই কারণে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত অধিক গুরুত্ব সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করা। তবে এটাও মনে রাখতে হবে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন লোক দেখানো কোন ফ্যাশন নয়। যে কোনও ব্যক্তির জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণভাবনার বিকাশের জন্যই আমাদের এই মানব জীবন লাভ। তাই অন্য আর কোনকিছুই এর থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না।

দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিক যুগে মানুষ এত বেশী অন্যান্য কাজে নিজেকে ব্যস্ত করে ফেলে যে তারা কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন ভুলে যায়। একেই বলে 'মায়া'। যার অর্থ ভ্রান্তি। তারা তাদের প্রকৃত কর্তব্য বিস্মৃত হয়। অন্যদিকে ভণ্ড, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য নেতারা আমাদের নারকীয় জীবনধারার দিকে পথ দেখাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এরা কেবল বিভ্রান্তিকারি মাত্র। যদিও মানুষ কোনরকম কর্তৃত্ব মেনে

চলতে চায় না, কিন্তু তারা এই ভণ্ড মানুষগুলোকেই নেতা হিসাবে মেনে নেয়। এইভাবেই ভণ্ড নেতারা এবং তাদের যারা অনুসরণ করছে, সেই হতভাগ্য মানুষগুলো জড় জাগতিক প্রকৃতির কঠোর নিয়মে আটকে পড়ছে।

তাই, যদি কোনওভাবে কেউ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসতে পারে তবে তখনই তাদের উচিত গুরুত্ব সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে আত্মসমর্পণ করা। আর যদি কেউ একান্তভাবে তা পারে তবে 'মায়ার' দ্বারা তার কোনওরকম ক্ষতি কখনই হবে না।

পারমার্থিক এবং জড়জাগতিক শিক্ষা

ইশোপনিষদে বলা হয়েছে "যাদের জ্ঞানের অভাব রয়েছে তারা অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢুকে পড়ে।" দুই ধরনের বিদ্যা আছে—জড় জাগতিক ও পারমার্থিক। 'জড় জাগতিক' শিক্ষা জড় বিদ্যা হিসাবে পরিচিত। 'জড়' শব্দটির অর্থ যা সচল হতে পারে না।' অর্থাৎ জড় বস্তু। চেতন কিন্তু সচল। আমাদের শরীরটি চেতন ও জড়জাগতিক সত্তার সংমিশ্রণে গঠিত। যতক্ষণ শরীরের মধ্যে আত্মা রয়েছে ততক্ষণ সেটি সচল। যেমন ধরুন একজন ব্যক্তির কোট বা প্যান্ট ততক্ষণই সচল যতক্ষণ ব্যক্তি সেগুলো পরে রয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কোট প্যান্টগুলো বুঝি নিজে নিজেই সচল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সচল হল আত্মা সমন্বিত শরীরটি। সেইরকম আমাদের শরীরটি সচল কারণ এর মধ্যে রয়েছে চিৎ সত্তা। যতক্ষণ চিৎ সত্তা রয়েছে ততক্ষণই শরীর সচল। আত্মা বেরিয়ে গেলেই শরীরটি একটি জড় বস্তুতে রূপান্তরিত হবে। এরকম আরেকটি দৃষ্টান্ত হল মোটরগাড়ি। মোটরগাড়ি ততক্ষণই সচল যতক্ষণ ড্রাইভার গাড়িটি চালাচ্ছেন। কিন্তু বোকারা মনে করে মোটরগাড়ি বুঝি আপনা আপনি চলছে। প্রকৃত সত্য হল অত্যাধুনিক কলকব্জা থাকলেও মোটরগাড়ি কখনই নিজে থেকে চলতে পারে না।

যেহেতু মানুষ শুধুমাত্র জড়বিদ্যায় শিক্ষিত হয়, তাই তারা মনে করে যে জড়া প্রকৃতিতে যত রকমের কাজকর্ম হয়ে চলেছে সবই বুঝি আপনা আপনি হচ্ছে। সমুদ্রতীরে গেলে আমরা দেখি সমুদ্রের ঢেউগুলো ছুটে আসছে। ঢেউগুলো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সচল নয়। বাতাস তাদের সচল রেখেছে। আবার অন্য কোনও এক শক্তি বাতাসকে সচল রেখেছে। এইভাবে যদি আপনারা প্রকৃত কারণটি খুঁজে বার করার জন্য ক্রমাগত পেছনে যেতে থাকেন তবে সবকিছুর কারণ হিসাবে খুঁজে পাবেন শ্রীকৃষ্ণকে। তিনিই সব কিছুর নিয়ন্তা। সর্বকারণের পরম কারণ। আর এই পরম কারণকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টাই হল প্রকৃত শিক্ষা।

তাই *ইশোপনিষদে* বলা হয়েছে যে জড়জাগতিক শক্তির বাহ্যিক সঞ্চালনগুলো লক্ষ্য করে যারা মোহগ্রস্ত হয়ে থাকেন তারা অজ্ঞানতার উপাসনা করছে। মোটরগাড়ি বা এরোপ্লেন কিভাবে ওঠানামা করে সেই সব কারিগরী বিদ্যা শেখানোর জন্য আধুনিক সভ্যতায় বড় বড় সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সেখানে শেখানো হয় কীভাবে এইসব যন্ত্র তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এমন কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে চিৎ সত্তা, আত্মা বিষয়ে চর্চা করা হয়। যথার্থ চালকের বিষয়টি নিয়ে কেউ চর্চা করে না। তার বদলে লোকে শুধু জড় বস্তুর বাহ্যিক সচলতা নিয়ে চর্চা করে চলেছে।

ম্যাসাচুয়েটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে আমি ভাষণ দিতে গিয়ে ছাত্রদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, "শরীরের মধ্যে যে চালকশক্তি তথা আত্মা রয়েছে, সেই বিষয়ে চর্চার জন্য কারিগরী শিক্ষা কোথায় হচ্ছে? তারা সেইরকম কারিগরী বিদ্যার কথা জানতই না। তাদের বিদ্যা শিক্ষা ছিল নিতান্তই জড়বিদ্যা আশ্রিত। এজন্য তারা কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি। *ইশোপনিষদে* বলা হয়েছে যে, এইরকম জড় জাগতিক শিক্ষার মাধ্যমে যারা উন্নত হওয়ার চেষ্টা করে তারা শুধু অস্তিত্বের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই বর্তমান সভ্যতা একটি অতি সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলছে। কারণ পৃথিবীর কোনও স্থানেই প্রকৃত পারমার্থিক বিদ্যাচর্চার স্থান নেই। এইভাবেই মানব সমাজকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক অতি দুর্বিষহ পরিবেশের মাঝে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা ॥
অনিত্য সংসারে মোহ জনমিয়া
জীবকে করয়ে গাধা ॥

এই গানের মধ্য দিয়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বুঝিয়েছিলেন যে, 'জড় জাগতিক শিক্ষা হল শুধুই মায়ার সম্প্রসারণ। যতই আমরা জড় জাগতিক শিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে থাকব, ততই আমাদের ভগবানকে উপলব্ধি করার সামর্থ্য কমতে থাকবে। অবশেষে আমরা বলব যে 'ভগবান মরে গেছে'। এসবই জড় জাগতিক শিক্ষার কুফলমাত্র। যার ফলস্বরূপ আমরা অজ্ঞ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকব।

সুতরাং বোঝা গেল যে জড় জাগতিক শিক্ষাবিদরা অবশ্যই মানুষকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আবার এক ধরনের তথাকথিত দার্শনিকেরা বুদ্ধিজীবী, ধর্মতত্ত্ববিদ ও যোগীসন্ন্যাসীরা রয়েছে, তারা ভগবান

শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ মর্যাদা দেয় না। তাই তারা আরও ভয়াবহ অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অথচ তারা ভান করে যে তারা কতই না পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান অনুশীলন করছেন। প্রকৃতপক্ষে তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তাই যারা জড়জাগতিক বিদ্যাশিক্ষায় মানুষকে আকৃষ্ট করছে, তাদের চেয়েও এরা বেশী ভয়ঙ্কর ও ক্ষতিকারক। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতরণের নামে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। যোগচর্চার নামে তারা মানুষকে ভুলপথে চালনা করছে। "শুধুমাত্র ধ্যান করুন, আর তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন আপনি ভগবান"। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু যোগচর্চার মাধ্যমে ভগবান হন নি। তাঁর জন্ম থেকেই তিনি ভগবান হয়ে আছেন। যখন তিনি মাত্র তিন মাসের একটি শিশু, তখন রাক্ষসী পূতনা তাকে আক্রমণ করেছিল-সেই রাক্ষসীর স্তন্যপানের সাথে সাথে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রাণবায়ু শোষণ করে নিয়েছিল। এইভাবেই জন্ম থেকে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। আর এটিই প্রকৃত ভগবৎ-সত্তা।

কিন্তু যোগী নামের ঐ সব ভণ্ড মানুষগুলো শেখায় "চুপচাপ বসে ধ্যান করলে আপনিও ভগবান হয়ে যাবেন।" কিন্তু বাসনা শূন্য হয়ে চুপচাপ ধ্যান করার কোনও উপায় আমাদের নেই। তাই এসবই বুজরুকি মাত্র। কারণ আমরা কখনই বাসনাশূন্য হয়ে থাকতে পারি না, কিন্তু এই কামনা বাসনা ও কার্যগুলিকে আমরা পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারি। আর এই পরিশুদ্ধতাই হল প্রকৃত জ্ঞান। আমাদের বাসনার মধ্যে থাকবে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার আকাঙ্খা। এইভাবেই কামনা বাসনার পরিশুদ্ধি ঘটবে। তাই শুধুমাত্র নিশ্চল হয়ে ধ্যান করার চেষ্টা না করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় মন প্রাণ উৎসর্গ করতে হবে। জীবসত্তা রূপে আমাদের বিভিন্ন রকম কামনা বাসনা,কাজকর্ম ও প্রেমময় আবেগ রয়েছে। কিন্তু এসবই আমাদের বিপথে চালিত করছে। কিন্তু আমরা যদি সেই সকল মনোবৃত্তিগুলোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিবেদন করতে পারি, তাহলেই আমাদের শিক্ষায় পরম সার্থকতা আসবে।

তাই বলে আমরা এমন বলছি না যে আপনি জড়জাগতিক শিক্ষায় পারদর্শী হওয়ার চেষ্টা করবেন না। সেটা অবশ্যই করা যেতে পারে। কিন্তু তার পাশাপাশি কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করে যেতে হবে। এটাই আমাদের বক্তব্য। যেমন আপনি মোটরগাড়ি তৈরি করবেন। কিন্তু সেই গাড়িগুলো যেন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় লাগে।

তাই অবশ্যই শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেটা যদি নিতান্তই জড়জাগতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য হয়—যদি তার মধ্যে কৃষ্ণসেবার মনোভাব না থাকে—তবে সেটা খুবই বিপজ্জনক। *ইশোপনিষদেও* এই শিক্ষাই দেওয়া হয়।

নিরীক্ষামূলক কোনও পদ্ধতির সাহায্যে সেটি যথার্থভাবে জানা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে কীভাবে জানতে পারবেন আপনার প্রকৃত বাবা কে? এটির যথার্থ উত্তর দিতে পারবে একমাত্র আপনার মা। এটি হল সাধারণ জ্ঞান। তাহলে আপনার জড়জাগতিক পিতাকেই আপনি পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে জানতে পারছেন না। সেখানে পরম পিতাকে কিভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারবেন? শ্রীকৃষ্ণই পরম পিতা। তিনি পিতার পিতারও পিতা, বংশানুক্রমে আপনি পর্যন্ত। তাহলে যদি আপনি আপনার পূর্বতন বংশের পিতাকে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে জানতে না পারেন, তাহলে সেই পদ্ধতিতে ভগবান অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে জানবেন কেমন করে?

এই পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতেই লোকে ভগবানকে খুঁজে পেতে চায়, কিন্তু বহু চেষ্টার পর তারা বিফল হয়। আর তখন তারা বলতে শুরু করে যে "ভগবান নেই। আমিই ভগবান।" কিন্তু *ঈশোপনিষদে* বলা হয়েছে যে, পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে ভগবানকে জানবার, খুঁজবার চেষ্টা না করে শ্রুতির মাধ্যমে তাকে উপলব্ধির চেষ্টা করতে হয়। আর এই শ্রবণ করবেন কার কাছে? কোনও দোকানীর কাছে? গোঁড়া ভণ্ডদের কাছে? এর উত্তর হল, যারা ধীর স্থির, তাঁদের কাছে ভগবৎতত্ত্ব শুনতে হয়। 'ধীর' মানে জড় জাগতিক প্রভাবে যার ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় না।

ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বা চিত্ত চাঞ্চল্য বিভিন্ন ধরনের। যেমন মন ও বাক্যের চাঞ্চল্য, ক্রোধের উত্তেজনা, জিহ্বা, উদর ও যৌনাঙ্গের উত্তেজনা। যখন আমাদের ক্রোধ হয় তখন আমরা সব কিছু ভুলে যাই। সেইসময় আমরা কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ করি ও অসংলগ্ন কথাবার্তা বলি। জিহ্বাকে উত্তেজিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়— যেমন "এই যে ভাল মদ, এখানে মুরগীর মাংস, গরুর মাংস।" কিন্তু প্রশ্ন হল এই মদ, মুরগী বা গরুর মাংস না খেলে কি আমরা মরে যাব? অবশ্যই না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষের জন্য শাকসব্জী, ফল, দুধ ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর বহু খাদ্য প্রদান করেছেন।

গাভী প্রচুর পরিমাণে দুধ দেয়, তবে তা শুধু নিজের জন্য নয়। মানুষের জন্যও। এটিই আমাদের যথার্থ খাদ্য। শ্রীভগবান বলেছেন, "হে গাভী, যদিও তুমি দুধ উৎপাদন কর, কিন্তু তুমি নিজে তা খেতে পারবে না। এই দুধ মানুষের জন্য, কারণ তারা অন্য সব প্রাণীদের থেকে উন্নত।" তবে অবশ্য, শৈশবে প্রত্যেকেই মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়, তাই বাছুরও খানিকটা মায়ের দুধ পাবে। কিন্তু গাভী অনেক বেশী দুধ উৎপাদন করে, যেটি শুধু আমাদের জন্যই।

সুতরাং আমাদের যথার্থ খাদ্য হিসাবে ভগবান যা কিছু বরাদ্দ করে রেখেছেন, তাই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু আমরা তা করি না। বরং জিহ্বার সন্তুষ্টির জন্য আমরা ভাবি "শুধুমাত্র শস্য, শাকসব্জী, ফলমূল বা দুগ্ধজাত দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকলে আমাদের চলবে কেন? তার জন্য আমরা কসাইখানা খুলি ও নিরীহ গরুগুলোকে মেরে ফেলি। তাহলে মূল ব্যাপারটা হল আমরা প্রথমে গরুর দুধ পান করে বড় হই, পরে সেই গরুগুলোকেই হত্যা করি শুধুমাত্র নিজেদের জিহ্বার সন্তুষ্টি মেটাতে।" আমাদের এ ধরনের বাজে চিন্তা থেকে সরে আসা উচিত, এবং ধীর ব্যক্তি বা গোস্বামীদের কথা শোনা উচিত যারা নিজেদের ইন্দ্রিয় বেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কারণ 'স্বামী' বা 'গোস্বামী'রা ছ'টি ইন্দ্রিয়কে দমন করতে পারেন, যেগুলি হল বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদর বেগ এবং যৌন বেগ।

'কুমারসম্ভব' নামে কালিদাসের একটি সুন্দর কাব্য আছে যেখানে শিব কিভাবে ধীর স্বভাব সম্পন্ন হয়েছিলেন তার বর্ণনা রয়েছে। দেবাদিবের শিবের পত্নী সতী যখন জানতে পারলেন যে তাঁর পিতা যজ্ঞস্থলে শিবকে অপমান করেছে, তখন তিনি আত্মহত্যা করলেন। স্ত্রীর আত্মহত্যার খবর পেয়ে শিব প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হলেন এবং এই গ্রহ ত্যাগ করে অন্যত্র ধ্যানমগ্ন হতে চলে যান। সেই সময়ে সেখানে দৈত্য ও দেবতাদের মধ্যে একটি যুদ্ধ হচ্ছিল। সেই যুদ্ধে দেবতাদের একজন দক্ষ সেনাপতির প্রয়োজন হয়েছিল। দেবতারা অনেক ভেবে সিদ্ধান্তে এল যে যদি দেবাদিদেব শিবের একটি পুত্র থাকত তবে সে এই যুদ্ধে দেবতাদের নেতৃত্ব দিতে পারত। দেবাদিদেব শিব সেই সময় সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তাই দেবতারা সতীর আর এক অবতার পার্বতীকে সেখানে পাঠাল, যাতে করে যৌন সঙ্গমের জন্য শিব উত্তেজিত হন। কিন্তু শিব ধ্যানমগ্নই ছিলেন। তিনি কোনরকম ভাবে উত্তেজিত হননি। এই অংশের বর্ণনা করতে গিয়ে কালিদাস মন্তব্য করেছিলেন, 'ইনিই প্রকৃত ধীর'। তিনি ছিলেন নগ্ন। অথচ এক তরুণী তার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলেও তিনি উত্তেজিত হননি।"

'ধীর' বলতে এমন এক ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি উত্তেজনার কারণ থাকলেও উত্তেজিত হন না। যদি সেখানে খুব ভাল ভাল খাবার থাকে, তবুও 'ধীর' ব্যক্তির জিহ্বা তার আস্বাদ গ্রহণের জন্য লালায়িত হবে না। আবার সুন্দরী নারী বা পুরুষ দেখলেও 'ধীর' ব্যক্তি যৌন তাড়নার জন্য উত্তেজিত হবে না। আর এইভাবেই 'ধীর' ব্যক্তি উপরিল্লিখিত ছয় প্রকার উত্তেজনাকে প্রশমন করতে পারেন। দেবাদিদেব শিব কিন্তু সঙ্গমে অক্ষম ছিলেন না। তিনি ছিলেন 'ধীর'। সেরকমই

শ্রীকৃষ্ণ বহু গোপবালিকাদের সঙ্গে নৃত্য করলেও সেখানে কোনরূপ যৌন সম্ভোগের লালসা ছিল না।

এজন্য 'ধীর' ব্যক্তির কাছ থেকেই আপনাকে তত্ত্বকথা শুনতে হবে। অন্যদিকে 'অধীর' অর্থাৎ অসংযমী ব্যক্তির কাছ থেকে তত্ত্বকথা শুনলে, সবই ব্যর্থ হবে। *ঈশোপনিষদে* বলা হয়েছে, একজন ছাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্য তার গুরুদেবের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করছে, এবং গুরুদেব উত্তরে বলছেন "এই সব কথাই প্রামাণ্য সূত্রে আমি শুনেছি।" গুরুদেব তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে কিছুই বলছেন না। তিনি যা কিছু শ্রবণ করেছেন, যথাযথভাবে তাই বলছেন।

সুতরাং আর কোনও গবেষণার প্রয়োজন নেই। কারণ সবকিছুই বলা আছে। শুধু ধীর ও সংযমী ব্যক্তির কাছ থেকে আমাদের সেই পারমার্থিক জ্ঞান শ্রবণ করতে হবে। এটিই বৈদিক জ্ঞান অর্জনের পন্থা। এর বাইরে অন্য কোনও পদ্ধতিতে বৈদিক জ্ঞান আহরণ করতে গেলে অজ্ঞতার অন্ধকারেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে হবে।

ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, "অজ্ঞানতার তত্ত্ব ও পারমার্থিক জ্ঞানের তত্ত্ব যিনি একই সাথে আয়ত্ত করতে পারেন, তিনি জন্ম জন্মান্তরে পুনরাবর্তনের প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত হন এবং অমরত্ব লাভের পূর্ণ সৌভাগ্য অর্জন করেন। অমরত্ব আসলে কি, তা মানুষ জানে না। তারা ভাবে এটি একটি পৌরাণিক ধারণা মাত্র। তারা নিজেদের জড় জাগতিক জ্ঞান নিয়েই গর্বিত থাকে। কিন্তু তার বাইরে যে সব জিনিস জানার আছে সে বিষয়ে তারা একেবারেই অজ্ঞ। তাছাড়া আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যেও তারা সেই সব তথ্য আয়ত্ত করতে পারে না।

তাই আপনি যদি যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে চান তবে আপনাকে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে। ('বেদ' কথাটির অর্থ জ্ঞান) এই বেদশাস্ত্রেরই অংশ হল ১০৮টি উপনিষদ, যেগুলির মধ্যে ১১টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই এগারোটির মধ্যে *ঈশোপনিষদের* স্থান সবার ওপর। *উপনিষদের* 'উপ' মানে 'কাছে'। তাই *ঈশোপনিষদে* নিবদ্ধ জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমেই আপনারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছাকাছি যেতে পারবেন।

বিদ্বৎ সমাজে বেদশাস্ত্রকে 'শ্রুতি' বলা হয়। অর্থাৎ শ্রবণের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য প্রমাণ সম্ভার। *বেদ* কিন্তু অশুদ্ধ চিত্ত, বদ্ধ ভাবধারায় আবদ্ধ জীবগণের গবেষণার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি। এইসব আধুনিক মানুষদের ইন্দ্রিয় অসম্পূর্ণ, তাই তারা সবকিছুকে পূর্ণাঙ্গরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। তারা কেবল তত্ত্ব গঠন করতে পারে যে "এটা এমন হতে পারে, সেটা ওরকম হতে পারে।" এটা জ্ঞান

নয়। কারণ জ্ঞান নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। তাতে কোনও ভ্রান্তি থাকতে পারে না। বদ্ধজীব মাত্রেই ভুল করে, মোহগ্রস্ত হয় ও প্রতারণা করে। কিভাবে তারা প্রতারণা করে? যখন কেউ *ভগবদ্গীতা* সঠিকভাবে না বুঝে সেই সম্পর্কে কোনও ভাষ্য রচনা করে তখন, নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি সাধারণ মানুষকে ঠকায়। যেমন মনে করুন পণ্ডিত হিসাবে কারও কোনও খেতাব আছে। তাই *ভগবদ্গীতার* জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে সে একটি ভাষ্য লিখে ফেলে। ঐসব তথাকথিত পণ্ডিতেরা দাবি করে যে কেউ নিজ অভিমত ব্যক্ত করতে পারে। কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, শুধুমাত্র তাঁর ভক্তরাই *ভগবদ্গীতার* মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে। এর থেকে বোঝা যায় যে এইসব তথাকথিত পণ্ডিতরা সাধারণ মানুষকে ঠকাচ্ছে।

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, যদি আপনি যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন করতে চান, তাহলে আপনাকে পারমার্থিক সদ্‌গুরুর কাছে যেতে হবে, যিনি পরম তত্ত্বজ্ঞান যথার্থই উপলব্ধি করেছেন। অন্যথায় আপনাকে অন্ধকারেই থাকতে হবে। আপনি এমনটা ভাববেন না যে, "পারমার্থিক সদ্‌গুরু না পেলেই বা কি হয়েছে। অনেক অনেক গ্রন্থ রয়েছে, সেগুলো থেকে আমি সব শিখে নিতে পারব।" কিন্তু বৈদিক অনুশাসনে বলা হয়েছে, *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*। 'গচ্ছেৎ' শব্দটির অর্থ— "যেতেই হবে" এটা নয় যে গেলেও হবে, না গেলেও হবে। অর্থাৎ পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান যথার্থভাবে আহরণ করতে হলে পারমার্থিক গুরুর কাছে যেতেই হবে, এটিই বৈদিক অনুশাসন বিধি।

দুটি জিনিস আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে— মায়া (বিভ্রান্তি) কি ও শ্রীকৃষ্ণ কে? তাহলেই আপনার জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে। অবশ্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনই চমৎকার যে, কোনওভাবে কেউ যদি তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন, তাহলে তার সমস্ত অনুসন্ধানের অবসান হবে। তার ফলে আপনি শুধু শ্রীকৃষ্ণ কে তাই-ই উপলব্ধি করবেন না, সেই সাথে আপনি বুঝবেন মায়া কি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আপনাকে এই উপলব্ধির জন্য যথার্থ বুদ্ধি দেবেন।

ঠিক এভাবেই পারমার্থিক গুরুদেব ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার মাধ্যমে মানুষ ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়। কেমনভাবে এটি সম্ভব হয়? উভয়ের কৃপা সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলে। যদি আপনি যথার্থভাবে পারমার্থিক গুরুদেবের সন্ধান চান, অথচ তাঁকে এখনও পাননি, তবে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই আপনাকে তাঁর সন্ধান দেবেন। আর যখন আপনি পারমার্থিক গুরুদেবের সন্ধান পেয়ে যাবেন, তখন তিনিই আপনাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে নিয়ে যাবেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই

চৈত্যগুরু হিসাবে আপনার হৃদয়ে অবস্থান করছেন। তিনিই পারমার্থিক গুরু রূপে অধিষ্ঠান করছেন। সুতরাং পারমার্থিক গুরুদেবই প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ প্রতিনিধি।

ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, আমাদের শেখা উচিত বিদ্যা ও অবিদ্যা কি। অবিদ্যা হল জড়জাগতিক জ্ঞানের ছদ্মরূপে অজ্ঞতা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর রচিত একটি গানে লিখেছিলেন, "জড়জাগতিক জ্ঞানের প্রসার হল প্রকৃতপক্ষে মায়ার রাজ্যবিস্তার। যতই আপনি নিজেকে জড়জাগতিক জ্ঞানে আবদ্ধ করবেন, ততই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের উপলব্ধির ক্ষমতা আপনার কমে যাবে। যারা জড়জাগতিক জ্ঞানে উন্নত তারা মনে করে "এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কি প্রয়োজন?" পারমার্থিক জ্ঞান আহরণের কোনও আগ্রহই তাদের নেই। অবিদ্যার মধ্যেই তারা নিজেদের নিমজ্জিত রাখে।

অনেক ভারতীয় ছেলেরা নিজ দেশের পারমার্থিক সংস্কৃতি বর্জন করে পাশ্চাত্যে যায় প্রযুক্তিবিদ্যা শেখার জন্য আর যখন তারা দেখে যে পাশ্চাত্য দেশে আমি সেই ভাবধারার প্রচলন করেছি যা তারা বর্জন করে এসেছে, তখন তারা অবাক হয়। পাশ্চাত্য দেশে আমার যাওয়ার একটি অন্যতম কারণ হল যে আধুনিক ভারত পারমার্থিক জ্ঞানচর্চা বর্জন করেছে। আজ ভারতীয়রা মনে করে যে তারা যদি পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিবিদ্যাকে অনুকরণ করতে পারে তবেই তারা সুখী হবে। এটাই মায়া। তারা এটা লক্ষ্য করে না যে তাদের থেকে যারা তিনশ গুণ বেশী প্রযুক্তিবিদ্যায় দক্ষ তারাই সুখী নয়। আগামী তিনশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে আমেরিকা বা ইউরোপের সমগোত্রীয় হতে পারবে না। কারণ এই দেশ দুটি বহু আগে থেকে প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ সাধন করেছে। কিন্তু সৃষ্টির আদি থেকেই ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিমূলক পারমার্থিক সভ্যতারূপে পরিচিত হয়ে এসেছে।

যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞান অথবা বেদ কখনই প্রযুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভর করে না। শ্রীল ব্যাসদেব বৈদিক জ্ঞানের আদি গুরু। তিনি কিরকম জীবন যাপন করতেন? বদ্রিকাশ্রমের একটি কুটিরে তিনি থাকতেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান দেখুন। *শ্রীমদ্ভাগবত* সহ তিনি অসংখ্য *পুরাণ* রচনা করেছেন। যেমন তিনিই রচনা করেছেন *বেদান্ত সূত্র* ও *মহাভারত*। যদি আপনি শ্রীল ব্যাসদেবের রচিত যাবতীয় শ্লোক অনুধাবন করার চেষ্টা করেন তবে আপনার সমস্ত জীবন কেটে যাবে। শুধুমাত্র *শ্রীমদ্ভাগবতেই* রয়েছে আঠারো হাজার শ্লোক। এই প্রতিটি শ্লোকের মর্মার্থ এতই গভীর যে তা অনুধাবন করতে সমগ্র জীবন লাগবে। বৈদিক সংস্কৃতি এরকমই।

বৈদিক শাস্ত্রের জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে অন্য কোনও জ্ঞানের তুলনা চলে না- শুধুমাত্র পারমার্থিক জ্ঞান নয়, জড়জাগতিক জ্ঞানও এর মধ্যে রয়েছে। বেদশাস্ত্রে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, সহ বিভিন্ন বিষয়ের মূল তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীনকালে কোনও বিমান ছিল না, একথা ঠিক নয়। *পুরাণে* বিমানের উল্লেখ রয়েছে। সেইসব বিমানগুলি এতই শক্তিশালী ও দ্রুতগামী ছিল যে সেগুলি সহজেই অন্য গ্রহগুলোতে পৌঁছতে পারত। বৈদিক যুগে জড়জাগতিক জ্ঞান চর্চার কোনও অগ্রগতি হয়নি, একথা সঠিক নয়। জড়জাগতিক জ্ঞান তখনও ছিল। কিন্তু তখনকার মানুষ এইসব জ্ঞানকে কোন গুরুত্বই দিত না। তারা কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্যই আগ্রহী ছিল।

সুতরাং প্রত্যেকেরই জানা উচিত কোনটি জ্ঞান আর কোন্‌টি অজ্ঞানতা। যদি আমরা অজ্ঞানতা অর্থাৎ জড়জাগতিক জ্ঞানে নিজেদের উন্নীত করি তবে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন চক্রে আমাদের ঘুরপাক খেতে হবে। তাছাড়া পরজন্মে কে কি হয়ে জন্মাবে, তা কেউই জানে না। এটার ওপর কারও হাত নেই। মনে করুন আপনি এজন্মে আমেরিকান হয়ে বেশ সুখে আছেন। কিন্তু মারা যাওয়ার পর এই শরীর ত্যাগ করে আপনি বলতে পারবেন না যে, "দয়া করে আমাকে আবার আমেরিকান করে দিন"। হয়ত আপনি আবার আমেরিকান হলেন, কিন্তু এবার মানুষ না হয়ে গরুর দেহ পেলেন। আর তারপর আপনার ভাগ্য নির্ধারণ হবে কসাইখানায়।

সুতরাং জড়জাগতিক জ্ঞান অনুশীলন— জাতীয়তাবাদ, সমাজতত্ত্ব, এই 'বাদ' ঐ 'বাদ'— সবই শুধু সময়ের অপচয়। প্রকৃতপক্ষে ভাল হল বৈদিক জ্ঞান অনুশীলন করা, যার ফলে মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে নির্দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করতে পারে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৯) বলেছেন, *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে*। অনেক অনেক জন্মের পর কোনও জীব যথার্থ জ্ঞানবান হতে পারলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করতে শেখে। তখন সে উপলব্ধি করে—"হে কৃষ্ণ, আপনিই সব কিছু।" যথার্থ জ্ঞানের অনুশীলনের ফলে এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায়।

ব্রহ্মজ্যোতির উর্ধ্বে

শ্রীঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, "প্রত্যেকের যথাযথভাবে জানা উচিত পরমেশ্বর ভগবানকে এবং তাঁর পবিত্র নাম, সেইসাথে তাঁর জাগতিক সৃষ্টি, অনিত্য দেবগণ, মানুষ জাতি ও পশুপক্ষীদের। এই সব যখন একজন জানতে পারবে, তখন

সেই ব্যক্তি মৃত্যুর অতীত সত্তা অর্জন করবে এবং অনিত্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাসঙ্গিক অস্তিত্ব অতিক্রম করে, ভগবৎ ধামে থাকার সৌভাগ্য লাভ করে। হে ভগবান, আপনিই সকল জীবের ত্রাতা, আপনার জ্যোতিপুঞ্জের উজ্জ্বলতায় আপনার প্রকৃত মুখশ্রী আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে। দয়া করে সেই আবরণ অপসারিত করে আপনার শুদ্ধ ভক্তদের সামনে প্রকাশিত হউন।

ঈশোপনিষদের এই অংশে ভগবৎ-ধামের উল্লেখ করা হয়েছে। অপ্রাকৃত জগৎ ও জড় জগৎ প্রতিটি গ্রহেই একজন অধিষ্ঠিত দেবতা রয়েছেন। যেমন সূর্যের অধিষ্ঠিত দেবতা বিবস্বান। *ভগবদ্গীতা* থেকেই আমরা এই তথ্য জানতে পারি। সেরকমই জড়জাগতিক আকাশে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র, আর প্রত্যেকটি গ্রহের মধ্যেই রয়েছে তার নিজস্ব অধিষ্ঠিত দেবতা।

জড় জাগতিক আকাশের বাইরে রয়েছে ব্রহ্মজ্যোতি, অর্থাৎ চিন্ময় আকাশ, যেখানে আবার রয়েছে অগণিত বৈকুণ্ঠ লোক। এই প্রতিটি বৈকুণ্ঠধামে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ রূপে অধিষ্ঠিত রয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন নামে— প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সংকর্ষণ প্রমুখ। তবে এইসব গ্রহগুলিকে কেউ দেখতে পায় না, কারণ এদেরকে ঢেকে রেখেছে ব্রহ্মজ্যোতির আলোকছটা। ঠিক যেমন সূর্যকিরণের আলোকছটার জন্য কেউ সূর্যগোলকটিকে দেখতে পায় না। চিন্ময় এই মহাকাশের জ্যোতিপ্রভা আসছে বৈকুণ্ঠধামের ঊর্ধ্বে অবস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজ ধাম গোলোক বৃন্দাবন থেকে। এই গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অধিপতি।

পরমতত্ত্ব স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম গোলোক বৃন্দাবন ব্রহ্মজ্যোতিতে আবৃত থাকে। সুতরাং শ্রীভগবানের দর্শন পেতে হলে সেই জ্যোতির আবরণ ভেদ করতে হবে। সুতরাং *ঈশোপনিষদে* ভক্তরা প্রার্থনা করেছেন, "দয়া করে আপনার জ্যোতিপ্রভা উন্মোচন করে আমাদের দর্শন দিন। মায়াবাদী দার্শনিকরা জানে না যে ব্রহ্মজ্যোতির পরে আরও কিছু আছে। কিন্তু এখানে *ঈশোপনিষদে* বৈদিক প্রামাণ্য তথ্য পরিবেশিত হয়েছে যে, ব্রহ্মজ্যোতিই পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃত মুখশ্রী আবৃত করে রেখেছে সুবর্ণমণ্ডিত আলোকছটায়।

এর থেকেই সহজে বোঝা যায় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম ও বৈকুণ্ঠ গ্রহগুলো সর্বদাই ব্রহ্মজ্যোতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং শুধুমাত্র ভক্তরাই সেই সব গ্রহগুলোতে প্রবেশাধিকারের দুর্লভ সুযোগ লাভ করতে পারেন। শুষ্ক জ্ঞানী ও মনোধর্মী ব্যক্তিরা ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যে অনুপ্রবেশের জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রতা পালন করেন। কিন্তু দৈত্যরা যখন শ্রীকৃষ্ণের হাতে বধ হয় তৎক্ষণাৎ তারা ব্রহ্মজ্যোতিতে পৌঁছে যায়।

তাহলে ভেবে দেখুন, যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের শত্রু দৈত্যরা পৌঁছে যায়, সেটি কি তেমন একটি বাঞ্ছিত ধাম?

যদি আমার শত্রুরা আমার বাড়ি আসে, তবে তাদেরকে থাকার জন্য আমি যে কোনও একটা জায়গা দিতে পারি। কিন্তু আমার কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধু যদি আসে তবে তাদেরকে আমি আরও ভাল জায়গায় থাকতে দেব। সুতরাং সেইদিক দিয়ে বিবেচনা করলে এই ব্রহ্মজ্যোতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী একটি সুন্দর কবিতা রচনা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছেন যে, ভগবানের কৃপাধন্য কোনও ভক্তের কাছে ব্রহ্মজ্যোতি নরকতুল্য। তাহলে স্বর্গ সম্বন্ধে কি ধারণা হয়? কর্মী অর্থাৎ ফলকামী কর্মব্যস্ত ব্যক্তিরা দেবতাদের বাসভূমি স্বর্গলোকে যেতে বিশেষভাবে আগ্রহী। কিন্তু ভক্তদের কাছে স্বর্গলোক শুধুমাত্র আকাশ কুসুমের মতো মায়াময় স্থান। তারা সেখানে যেতে মোটেই আকৃষ্ট হয় না। আবার আর এক দল যোগী আছে, যারা ইন্দ্রিয়াদি দমনের জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করে ও তার ফলে বিশেষ কিছু শক্তি সামর্থ্য অর্জন করে। ইন্দ্রিয় হল বিষধর সাপের মতন, কারণ যখনই আপনি ইন্দ্রিয় উপভোগে মত্ত হবেন তখনই ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি আপনাকে 'দংশন' করতে থাকবে। যার ফলে আপনার শুদ্ধ ব্যক্তিসত্তার অবনতি ঘটবে। কিন্তু ভক্তরা বলেন যে, "ইন্দ্রিয় অনুভূতির বিষধর সাপগুলোকে আমি ভয় করি না। কারণ আমি তাদের বিষদাঁত উপরে ফেলেছি।" অর্থাৎ ভক্তরা তাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করেছে। এজন্য সেই ইন্দ্রিয়গুলি থেকে আত্মতৃপ্তি লাভের জন্য তাদের কোনওরকম লালসা জাগে না। ফলে তাদের ইন্দ্রিয়গুলি জীবনের নারকীয় পরিবেশে তাদের অধঃপতিত করার সুযোগ পায় না।

এইভাবেই, ভগবৎ ভক্তরা সকল বিষয়েই কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীদের থেকে উচ্চ মর্যাদার স্থানে নিজেদের অধিষ্ঠিত করেছেন। ভক্তদের মর্যাদা সর্বোচ্চ, কেননা ভক্তি অনুশীনের মাধ্যমে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনই বলেননি যে জড়জাগতিক কর্মব্যস্ততার মাধ্যমে তাঁকে উপলব্ধি করা যাবে। কিংবা শুধুমাত্র চিন্তাভাবনা ও গবেষণার মধ্যে দিয়ে তাঁকে পওয়া যাবে। তিনি এও বলেননি যে অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলনের মাধ্যমেই তাঁকে বোঝা যাবে। সুস্পষ্টভাবেই তিনি *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) বলেছেন, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বত*"— অর্থাৎ "শুধুমাত্র ভক্তিমূলক ভগবৎ সেবার মাধ্যমেই আমাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।"

ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলন ছাড়া অন্য কোনও ধরনের প্রক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে পরমতত্ত্বের পূর্ণ উপলব্ধির সম্ভাবনা নেই। এটি ছাড়া অন্য কোনও পদ্ধতিই উপযুক্ত নয়, কারণ সেই সব প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে শুধুমাত্র জল্পনা কল্পনা। যেমন ধরুন, বিজ্ঞানীরা ভাবনা চিন্তা করতেই পারে সূর্যগ্রহটি কেমন? কিন্তু সেখানে তারা প্রবেশ লাভের কোনও সুযোগ পায় না। তাই সূর্য বাস্তবিকই কি ধরনের গ্রহ তা কিন্তু তারা জানতেও পারে না। তারা শুধু কতগুলো তত্ত্বকথা নিয়েই আলোচনা চালিয়ে যায়। একবার তিনজন অন্ধ ব্যক্তি একটি হাতির কাছে এসেছিল। হাতিকে স্পর্শ করেই তারা বুঝতে চাইছিল যে হাতি কেমন হয়? ওদের মধ্যে প্রথম জন হাতির পা স্পর্শ করে ভাবল হাতি বুঝি থামের মতন, দ্বিতীয় জন হাতির শুঁড় স্পর্শ করে মন্তব্য করল হাতি বুঝি সাপের মতন। আর তৃতীয় ব্যক্তি হাতির পেট স্পর্শ করে মনে করল হাতি বুঝি একটি বড় নৌকোর মতন। প্রকৃপক্ষে তাদের তিনজনের কেউই বুঝতে পারল না হাতি আসলে কি রকম?

কোনও জিনিস দেখবার সামথ্য যদি আপনার না থাকে, তবে আপনি কেবল সেই সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনাই করতে পারেন। এইজন্য *ঈশোপনিষদে* বলা হয়েছে, "দয়া করে আপনার শ্রীমুখের আবরণ স্বরূপ এই অপূর্ব জ্যোতিপুঞ্জ উন্মুক্ত করুন যাতে আপনাকে আমরা দর্শন করতে পারি।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর ভক্তের হৃদয়ে তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার পরিচয় পান, তাকে তিনি নিজেকে দর্শনের দিব্য ক্ষমতাও প্রদান করেন। এজন্য *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন*— অর্থাৎ ভগবৎ-প্রেমের অঞ্জন দিয়েই ভক্তরা ভগবানকে দর্শন করেন। যার ফলে নিজেদের হৃদয়ে তারা ভগবানের, অপূর্ব রূপমাধুরী অনুভব করতে পারেন। ভারতবর্ষে এক ধরনের বিশেষ কাজল পাওয়া যায়। সেই কাজল চোখে দিলে দৃষ্টি পরিস্কার হয়ে যায়। সেরকমই ভগবৎ প্রেমের অঞ্জন চোখে লাগালে, সেই চোখ দিয়ে আপনি স্বয়ং ভগবানকে দর্শন করতে পারবেন। এইটিই হল ভগবানকে উপলব্ধি করার একমাত্র পদ্ধতি। এই ভগবৎ প্রেম একমাত্র গড়ে উঠবে ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের মাধ্যমে এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে আপনার প্রেমভক্তি নিবেদনের মাধ্যমে। তাই যতই আপনি ভগবৎ-সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন, ততই ভগবানের প্রতি আপনার সুপ্ত ভালবাসা বিকশিত হবে। অবশেষে যখন আপনি ভগবৎ প্রেমের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিজেকে উন্নত করতে পারবেন, তখন থেকেই আপনি প্রতি মুহূর্তে ভগবানকে দর্শন করতে পারবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খারাপ কর্ম

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সার সমন্বিত এক সুপ্রাচীন সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ, যেখানে নানা অবতারে ভগবানের এবং তাঁর ভক্তগণের শিক্ষা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ত্রিংশতি অধ্যায়ে কপিলদেব নামে এক কৃষ্ণাবতার পাপের ফলসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর তাৎপর্যে মূল কথাটি বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ১ ঃ পরমেশ্বর ভগবান বললেন—মেঘপুঞ্জ যেমন শক্তিশালী বায়ুর প্রভাব জানে না, ঠিক তেমনই জড় চেতনায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি কালের অসীম বিক্রম জানতে পারে না, যার দ্বারা সে চালিত হয়।

তাৎপর্য ঃ মহান রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত চাণক্য বলেছেন যে, কোটি-কোটি টাকার বিনিময়েও এক মুহূর্ত কাল ফিরে পাওয়া যায় না। মূল্যবান সময়ের অপচয়ের ফলে, যে-বিরাট ক্ষতি হয়, তা কোন রকম গণনার দ্বারা হিসাব করা যায় না। মানুষের কাছে যতটুকু সময় রয়েছে, তা জাগতিক অথবা পারমার্থিক উভয় ক্ষেত্রেই, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা উচিত। বদ্ধ জীব একটি বিশেষ শরীরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাস করে, এবং শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি সম্পাদন করতে হয় এবং তার ফলে কালের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, যারা কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত নয়, তারা তাদের অজ্ঞাতসারে কালের প্রবল শক্তির দ্বারা বিচলিত হয়, ঠিক যেমন বায়ু মেঘপুঞ্জকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

শ্লোক ২ ঃ তথাকথিত সুখের জন্য জড়বাদীরা অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে যেসব প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জন করে, কালরূপে পরমেশ্বর ভগবান তা সবই বিনাশ করেন, এবং সেই জন্য বদ্ধ জীবেরা শোক করে।

তাৎপর্য ঃ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিরূপে কালের প্রধান কার্য হচ্ছে সব কিছু ধ্বংস করা। জড়বাদীরা জড় চেতনায় অর্থনৈতিক উন্নতির নামে কত বস্তু উৎপাদনের কাজে ব্যস্ত। তারা মনে করে যে, জড়-জাগতিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করার ফলে মানুষ সুখী হবে, কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, তারা যা কিছু সৃষ্টি করেছে, তা সবই কালের প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীতে কত শক্তিশালী সম্রাটেরা বহু কষ্ট স্বীকার করে এবং বহু অধ্যবসায়ের ফলে, তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু কালের

প্রভাবে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খ জড়বাদীরা বুঝতে পারে না যে, কেবল জড়-জাগতিক প্রয়োজনীয় বস্তুগলি উৎপাদন করে তারা তাদের সময়ের অপচয় করছে, কারণ কালের প্রভাবে সেই সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে। জনসাধারণের অজ্ঞতার ফলেই এই শক্তির অপব্যয় হচ্ছে, কারণ তারা জানে না যে, তারা নিত্য এবং তাদের এক নিত্য বৃত্তিও রয়েছে। তারা জানে না যে, কোন এক বিশেষ শরীরে জীবনের অবধি তার অন্তহীন যাত্রায় একটি পলকের মতো। সেই সত্য না জেনে, তারা এই অতি ক্ষুদ্র এক পলকের জীবনকে সর্বস্ব বলে মনে করে, এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনে তারা তাদের সময়ের অপচয় করে।

শ্লোক ৩ ঃ পথভ্রষ্ট জড়বাদী ব্যক্তি জানে না যে, তার দেহটি অনিত্য, এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত গৃহ, ক্ষেত্র এবং সম্পদ—সেই সবও অনিত্য। অজ্ঞানতাবশত সে সব কিছুকে নিত্য বলে মনে করে।

তাৎপর্য ঃ একজন জড়বাদী মনে করে যে, কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত ভক্তেরা পাগল এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে তারা তাদের সময় নষ্ট করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জানে না যে, সে নিজেই হচ্ছে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এক বদ্ধ পাগল, কারণ সে তার দেহটিকে নিত্য বলে মনে করছে, এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত গৃহ, দেশ, সমাজ এবং অন্য সমস্ত বস্তুগলিকেও নিত্য বলে মনে করছে। জড়বাদীদের গৃহ, ক্ষেত্র ইত্যাদিকে নিত্য বলে মনে করাকে বলা হয় *মায়া*। সেই কথা এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে *মোহাদ্ গৃহক্ষেত্রবসূণি*—কেবল মোহবশত জড়বাদীরা তাদের গৃহ, তাদের ক্ষেত্র, তাদের ধন-সম্পত্তি ইত্যাদিকে চিরস্থায়ী বলে মনে করে। এই মোহ থেকে পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, অর্থনৈতিক উন্নতি, যেগুলিকে আধুনিক সভ্যতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, সেইগুলির বিকাশ হয়েছে। কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি জানেন যে, মানব-সমাজের এই অর্থনৈতিক উন্নতি কেবল অনিত্য মায়া।

শ্রীমদ্ভাগবতের আর এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেহকে আত্মা বলে মনে করা, এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের আত্মীয় বলে মনে করা এবং নিজের জন্মভূমিকে পূজ্য বলে মনে করা পাশবিক সভ্যতার পরিণতি। কিন্তু কেউ যখন কৃষ্ণভাবনায় আলোক প্রাপ্ত হন তখন তিনি সেইগুলি ভগবানের সেবায় ব্যবহার করতে পারেন। সেইটি একটি অত্যন্ত উপযুক্ত প্রস্তাব। সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত। যখন সমস্ত অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জড় প্রগতি কৃষ্ণভাবনার প্রসারের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন প্রগতিশীল জীবনের এক নতুন অবস্থার উদয় হয়।

শ্লোক ৪ ঃ জীব এই সংসারে যে যেই যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, সেই যোনিতেই সে বিশেষ সন্তোষ লাভ করে, এবং সেই অবস্থায় সে কখনও বিরক্ত হয় না।

তাৎপর্য ঃ জীব কোন বিশেষ শরীরে, তা যতই ঘৃণ্য হোক না কেন, যে সন্তোষ উপভোগ করে, তাকে বলা হয় মায়া। উচ্চতর পদে রয়েছে যে মানুষ, সে নিম্ন স্তরের মানুষের জীবনের প্রতি বিরক্তি অনুভব করতে পারে, কিন্তু নিম্ন স্তরের মানুষটি মায়ার প্রভাবে সেই অবস্থাতেই তৃপ্ত। মায়ার কার্যের দুইটি অবস্থা রয়েছে। একটিকে বলা হয় *প্রক্ষেপাত্মিকা*, এবং অন্যটিকে বলা হয় *আবরণাত্মিকা*। *আবরণাত্মিকা* মানে হচ্ছে 'আচ্ছাদনকারী', এবং *প্রক্ষেপাত্মিকা* মানে হচ্ছে 'নীচে ফেলে দেওয়া।' জীবনের যে কোন অবস্থাতেই, জড়বাদী ব্যক্তিরা অথবা পশুরা সন্তুষ্ট থাকে, কারণ তাদের জ্ঞান মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন। জীবনের নিম্ন স্তরে বা নিম্ন যোনিতে চেতনার বিকাশ এতই কম যে, সে বুঝতে পারে না সে সুখী না দুঃখী। এইটিকে বলা হয় *আবরণাত্মিকা*। বিষ্ঠাভোজী শূকরও নিজেকে সুখী বলে মনে করে, যদিও উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তি দেখতে পায় যে, একটি শূকর হচ্ছে বিষ্ঠাভোজী। সেই জীবনটি কত ঘৃণ্য।

শ্লোক ৫ ঃ যে বিশেষ যোনিতে বদ্ধ জীব রয়েছে, তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। মায়ার আবরণাত্মক প্রভাবের দ্বারা বিমোহিত হয়ে, নরকে থাকলেও, তার সেই শরীরকে সে ত্যাগ করতে চায় না, কারণ সেই নারকীয় অবস্থাকেই সে সুখকর বলে মনে করে।

তাৎপর্য ঃ শোনা যায় যে, এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁর গুরুদেব বৃহস্পতির দ্বারা শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন, এবং এই পৃথিবীতে একটি শূকররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বহুকাল পরে যখন ব্রহ্মা তাঁকে স্বর্গলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান, তখন স্বর্গলোকে তাঁর দেবরাজের পদ বিস্মৃত ইন্দ্র স্বর্গলোকে ফিরে যেতে নারাজ হন। এইটি হচ্ছে মায়ার সম্মোহনী শক্তি। ইন্দ্র পর্যন্ত তাঁর স্বর্গলোকের জীবনের কথা ভুলে গিয়ে, একটি শূকরের জীবন লাভ করে সন্তুষ্ট থাকে। মায়ার প্রভাবে বদ্ধ জীবেরা তাদের বিশেষ শরীরের প্রতি এত আসক্ত হয়ে পড়ে যে, তাকে যদি বলা হয়, "এই শরীরটি ত্যাগ কর, তা হলে এখনই একটি রাজার শরীর প্রাপ্ত হবে," সেই প্রস্তাবে সে রাজি হবে না। এই আসক্তি সমস্ত বদ্ধ জীবেদের অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঘোষণা করছেন, "এই জড় জগতে সব কিছু পরিত্যাগ কর। আমার কাছে এস, তা হলে আমি তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করব।" কিন্তু আমরা

তাঁর সেই প্রস্তাব গ্রহণ করছি না। আমরা মনে করছি, "আমরা বেশ ভালই আছি। কেন আমরা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হব এবং তাঁর ধামে ফিরে যাব?" একেই বলা হয় মায়া। প্রত্যেকেই তার জীবনের স্তরে সন্তুষ্ট, তার সেই জীবন যতই জঘন্য হোক না কেন।

শ্লোক ৬ ঃ দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতির প্রতি গভীর আসক্তির ফলে, জীব তার জড়-জাগতিক জীবনে এই প্রকার সন্তোষ অনুভব করে। এই প্রকার সঙ্গ প্রভাবে বদ্ধ জীব নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করে।

তাৎপর্য ঃ মানব-জীবনের এই তথাকথিত পূর্ণতা মনগড়া কল্পনা মাত্র। তাই বলা হয় যে, জড়বাদীদের জড় গুণে যতই গুণবান বলে মনে করা হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন গুণই নেই, কারণ তারা কেবল মনোরথে বিচরণ করছে, যা তাদের পুনরায় অনিত্য জড়-জাগতিক অস্তিত্বে অধঃপতিত করবে। যারা মনোধর্মী, তারা কখনও চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে না। এই প্রকার মানুষ পুনরায় জড়-জাগতিক জীবনে অধঃপতিত হতে বাধ্য। তথাকথিত সমাজ, বন্ধুত্ব এবং ভালবাসার সংসর্গের ফলে, বদ্ধ জীব আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট বলে মনে হয়।

শ্লোক ৭ ঃ উৎকণ্ঠায় সর্বক্ষণ দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, এই প্রকার মূর্খেরা তাদের তথাকথিত কুটুম্বদের ভরণ-পোষণের জন্য দুরাশাগ্রস্ত হয়ে, সর্বদা নানা প্রকার পাপকার্যে লিপ্ত হয়।

তাৎপর্য ঃ বলা হয় যে, একটি বিশাল সাম্রাজ্য চালানোর থেকে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের ভরণ-পোষণ করা কঠিন, বিশেষ করে এখনকার দিনে, যখন কলি যুগের প্রভাব এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, মায়ার পরিবার স্বীকার করার ফলে, সকলেই সর্বদা বিচলিত এবং উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। যে পরিবারের ভরণ-পোষণ আমরা করি, তা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট; তা কৃষ্ণলোকের পরিবারের বিকৃত প্রতিফলন। কৃষ্ণলোকেও পরিবার, বন্ধু, সমাজ, পিতা-মাতা- সব কিছুই রয়েছে; কিন্তু সেখানে সবই নিত্য। এখানে, যখন আমরা দেহ পরিবর্তন করি, তখন আমাদের পারিবারিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয়। কখনও আমরা মানুষের পরিবারে, কখনও দেবতাদের পরিবারে কখনও বিড়ালের পরিবারে অথবা কখনও কুকুরের পরিবারে জন্ম গ্রহণ করি। পরিবার, সমাজ এবং বন্ধুত্ব ক্ষণস্থায়ী, তাই তাকে বলা হয় অসৎ। কথিত হয় যে, যতক্ষণ আমরা এই অসৎ, অনিত্য, অলীক সমাজ এবং পরিবারের প্রতি আসক্ত হই, ততক্ষণ আমরা সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকি। জড়বাদীরা জানে না যে, এই জড় জগতে পরিবার, সমাজ ও বন্ধুত্ব প্রতিবিম্ব মাত্র, এবং এইভাবে

তারা তাদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবে তাদের হৃদয় সর্বদা দগ্ধ হয়, কিন্তু সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও, তারা এই মিথ্যা পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, কারণ শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে প্রকৃত পরিবারের সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না।

শ্লোক ৮ ঃ যে রমণী মায়ার দ্বারা তাকে মোহিত করে, তাকেই সে তার হৃদয় এবং ইন্দ্রিয় অর্পণ করে। নির্জন স্থানে সে তার আলিঙ্গন এবং গোপন আলাপের দ্বারা তার সঙ্গসুখ উপভোগ করে, এবং শিশুদের আধ-আধ মিষ্টি বুলিতে সে মুগ্ধ হয়ে থাকে।

তাৎপর্য ঃ মায়ার রাজ্যের ভিতর পারিবারিক জীবন শাশ্বত জীবের পক্ষে ঠিক একটি কারাগারের মতো। কারাগারে কয়েদি লৌহ-শৃঙ্খল এবং লৌহ-পিঞ্জরের দ্বারা বন্দি থাকে। তেমনই বদ্ধ জীব রমণীর মনোহর সৌন্দর্যের দ্বারা, নির্জন স্থানে তার আলিঙ্গনের দ্বারা, তথাকথিত প্রেম আলাপের দ্বারা, এবং তার শিশু সন্তানদের আধ-আধ বুলির দ্বারা বন্দি হয়ে রয়েছে। এই ভাবে সে তার প্রকৃত পরিচয় ভুলে যায়।

এই শ্লোকে *স্ত্রীণামসতীনাম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, রমণীর প্রেম কেবল পুরুষের মনকে বিচলিত করার জন্য। প্রকৃত পক্ষে এই জড় জগতে প্রেম বলে কিছু নেই। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই কেবল তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি চায়। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য স্ত্রী এক মায়িক প্রেম সৃষ্টি করে, এবং পুরুষ সেই মায়িক প্রেমে মোহিত হয়ে, তার প্রকৃত কর্তব্য বিস্মৃত হয়। এই প্রকার মিলনের ফলে যখন সন্তান উৎপন্ন হয়, তখন পরবর্তী আকর্ষণ হচ্ছে সেই শিশুর আধ-আধ মিষ্টি বুলি। গৃহে স্ত্রীর প্রেম এবং শিশুর মিষ্টি বুলি মানুষকে খুব ভালভাবে বন্দি করে রাখে, এবং তার ফলে সে তার গৃহ ত্যাগ করতে পারে না। বেদের ভাষায় এই প্রকার ব্যক্তিকে বলা হয় *গৃহমেধী*, অর্থাৎ 'যার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তার গৃহ।' গৃহস্থ হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর পরিবার, পত্নী এবং সন্তানদের সঙ্গে থাকেন, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করা। তাই মানুষকে গৃহস্থ হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়, গৃহমেধী হতে নয়। গৃহস্থের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে মায়া-রচিত পারিবারিক জীবন থেকে মুক্ত হয়ে, কি করে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরিবারে প্রবেশ করা যায়; আর গৃহমেধীদের কাজ হচ্ছে তথাকথিত পারিবারিক জীবনে নিজেকে জন্ম-জন্মান্তরে বার বার জড়িয়ে ফেলে নিরন্তর মায়ার অন্ধকারে থাকা।

শ্লোক ৯ ঃ আসক্ত গৃহব্রত ব্যক্তি কূটনীতি এবং রাজনীতিতে পূর্ণ পারিবারিক জীবনে অবস্থান করে। সর্বদা দুঃখ বিস্তার করে এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যের দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত হয়ে, সে তার দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের জন্যই কেবল কর্ম করে যদি সে সেই দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনে সমর্থ হয়, তখন সে নিজেকে সুখী বলে মনে করে।

তাৎপর্য ঃ *ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্বয়ং ঘোষণা করেছেন যে, এই জড় জগৎ অশাশ্বত এবং দুঃখময়। এই জড় জগতে ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয় সুখের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুখের নামে যা কিছু হচ্ছে, তা সবই মায়া। এই জড় জগতে, সুখ মানে হচ্ছে দুঃখের নিবৃত্তি সাধনে সফল হওয়া। এই জড় জগৎ এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, কেউ যদি চতুর কূটনীতিজ্ঞ হতে না পারে, তা হলে তার জীবন ব্যর্থ হয়। কেবল মানব-সমাজেই নয়, পশু, পক্ষী মৌমাছি ইত্যাদি নিম্নতর স্তরের জীব-সমাজেও আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের দৈহিক প্রয়োজনগুলি চতুরতার সঙ্গে পূরণ করা হয়। মানব-সমাজে রাষ্ট্রীয় স্তরে অথবা ব্যক্তিগত স্তরে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়, এবং সেই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভের জন্য সমগ্র মানব-সমাজ কূটনীতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত কূটনীতি এবং জীবন-সংগ্রামে সমস্ত বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে নিমেষের মধ্যে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। তাই, এই সংসারে সুখী হওয়ার জন্য আমাদের সমস্ত প্রয়াস মায়া-রচিত মোহ মাত্র।

শ্লোক ১০ ঃ সে ইতস্তত হিংসা আচরণ করে ধন-সম্পদ অর্জন করে, এবং যদিও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সে তা করে, কিন্তু সে নিজে কেবল সেই অর্থের দ্বারা কেনা খাদ্যের স্বল্পমাত্র অংশই আহার করে, এবং এইভাবে যাদের জন্য সে অন্যায়ভাবে ধন সংগ্রহ করেছিল, তাদেরই জন্য সে নরকগামী হয়।

তাৎপর্য ঃ বাংলায় একটি প্রবাদ আছে 'যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর।' পরিবারের যে-সমস্ত সদস্যদের জন্য বিষয়াসক্ত মানুষ নানাবিধ পাপকর্মে রত হয়, তারা কখনই সন্তুষ্ট হয় না। মোহের বশে বিষয়াসক্ত মানুষ পরিবারের এই সমস্ত সদস্যদের সেবা করে, এবং তাদের সেবা করার ফলে, তাকে জীবনের নারকীয় অবস্থায় প্রবেশ করতে হয়। যেমন, একটি চোর তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য চুরি করে, এবং সে যখন ধরা পড়ে, তখন তাকে কারাগারে দণ্ডভোগ করতে হয়। জড় অস্তিত্বের এবং জড়-জাগতিক সমাজ, বন্ধু এবং প্রেমের এটিই হচ্ছে সারমর্ম। পরিবারের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সর্বদা ছলে বলে কৌশলে ধন সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে, সে নিজে কিন্তু এই

প্রকার পাপ কর্ম ব্যতীত যতটুকু ভোগ করতে পারত, তার থেকে বেশি কিছু ভোগ করতে পারে না। একটি মানুষ যে দিনে এক পোয়া খাবার খায়, কিন্তু তাকে হয়তো একটি বিরাট পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে হয়, এবং পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য যে-কোন উপায়েই হোক না কেন অর্থ সংগ্রহ করতে হয়, কিন্তু সে নিজে তার আহারের ক্ষমতার অতিরিক্ত আর কিছু পায় না, এবং অনেক সময় তাকে তার পরিবারের অন্য সমস্ত সদস্যদের ভুক্তাবশিষ্টই আহার করতে হয়। অন্যায়ভাবে ধন সংগ্রহ করা সত্ত্বেও, সে নিজে তার জীবন উপভোগ করতে পারে না। এইটিকে বলা হয় মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তি।

সমাজ, দেশ এবং জাতির প্রতি ভ্রমাত্মক সেবার পন্থাটি সর্বত্রই এক প্রকার, এবং তা বড় বড় রাষ্ট্র-নেতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনেক সময় রাষ্ট্রনেতা, যে তার দেশ-সেবার ফলে অত্যন্ত মহৎ হয়েছে, সেবার ভুলের জন্য তাকে তার দেশবাসীর হাতে নিহত হতে হয়। অর্থাৎ, তার ভ্রমাত্মক সেবার দ্বারা কেউই তার আশ্রিতদের সন্তুষ্ট করতে পারে না, যদিও সেই সেবা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে না, কেননা সেবা করাই হচ্ছে স্বরূপগত বৃত্তি। জীব তার স্বরূপে পরম পুরুষের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু সেই পরম পুরুষের সেবা করার কথা ভুলে গিয়ে, সে অন্যদের সেবায় ব্রতী হয়; তাকে বলা হয় মায়া। অন্যদের সেবা করে সে মনে করে যে, সে হচ্ছে প্রভু। পরিবারের কর্তা মনে করে যে, সে পরিবারের প্রভু, অথবা রাষ্ট্রনেতা মনে করে যে, সে রাষ্ট্রের প্রভু, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা দাসত্ব করছে, এবং এইভাবে মায়ার দাসত্ব করার ফলে, তারা ধীরে ধীরে নরকগামী হচ্ছে। অতএব, প্রকৃতিস্থ মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে তাঁর জীবন, তাঁর সমস্ত সম্পদ, তাঁর সমস্ত বুদ্ধি এবং তাঁর কথা বলার সমস্ত শক্তি দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ১১ ঃ যখন তার জীবিকায় সে ব্যর্থ হয়, তখন সে বার বার তার অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে, কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টায় সে যখন ব্যর্থ হয় এবং বিনষ্ট হয়, তখন সে অত্যধিক লোভের কারণে, অন্যের ধন গ্রহণ করে।

শ্লোক ১২ ঃ যখন সেই দুর্ভাগা তার পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণে অক্ষম হয়ে হতশ্রী হয়, তখন সে তার ব্যর্থতার কথা চিন্তা করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শোক করে।

শ্লোক ১৩ ঃ তাদের পালন-পোষণে তাকে অসমর্থ দেখে, তার পত্নী এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা তাকে আর আগের মতো সম্মান করে না, ঠিক যেমন নির্দয় কৃষকেরা বৃদ্ধ বলদকে অযত্ন কর।

তাৎপর্য ঃ কেবল এই যুগেই নয়, অনাদি কাল ধরে উপার্জনে অক্ষম বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কেউই পছন্দ করে না। এমন কি বর্তমান যুগেও, কোন কোন জাতি বা দেশে বৃদ্ধদের বিষ দেওয়া হয়, যাতে তারা তাড়াতাড়ি মরে যায়। কোন কোন নরখাদক সমাজে, বৃদ্ধ পিতামহকে মেরে ফেলে, উৎসব করে তার মাংস খাওয়া হয়। এখানে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, কার্য করতে অক্ষম বৃদ্ধ বলদকে কৃষক চায় না। তেমনই পরিবারে আসক্ত ব্যক্তি যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং উপার্জন করতে অক্ষম হয়, তখন তার পত্নী, পুত্র, কন্যা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে আর পছন্দ করে না, এবং তখন তাকে সম্মান প্রদর্শন করা তো দূরের কথা, তারা তাকে রীতিমতো অবহেলা করে। তাই, বৃদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই পরিবারের আসক্তি পরিত্যাগ করে, পারমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করাই সমীচীন। মানুষের কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা, যাতে ভগবান তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন, এবং তিনি যেন আর তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা উপেক্ষিত না হন।

শ্লোক ১৪ ঃ কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই মূর্খ সংসার জীবনের প্রতি বিরক্ত হয় না। যাদের সে এক সময় পালণ করেছিল, তাদরেই দ্বারা অবজ্ঞাভরে সে পালিত হয়। জরার প্রভাবে বিরূপাকৃতি হয়ে, সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে।

তাৎপর্য ঃ পারিবারিক আসক্তি এতই প্রবল যে, বৃদ্ধ অবস্থায় নিজের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা উপেক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, সে পরিবারের প্রতি তার প্রেম ত্যাগ করতে পারে না, এবং সেই গৃহে ঠিক একটি কুকুরের মতো সে অবস্থান করে। বৈদিক জীবন ধারায় মানুষকে সবল থাকা কালেই পারিবারিক জীবন ত্যাগ করতে হয়। সেখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, অত্যন্ত দুর্বল এবং জড় কার্যকলাপের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার পূর্বে, এবং রোগগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে, মানুষের উচিত গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে জীবনের বাকি দিনগুলি ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে যুক্ত করা। তাই, বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পঞ্চাশ বছর বয়স অতিক্রম করা মাত্রই, গৃহস্থের কর্তব্য সংসার জীবন পরিত্যাগ করে একাকী বনে বাস করা। এইভাবে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করার পর, প্রতিটি ঘরে ঘরে পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করার জন্য, তার উচিত সন্ন্যাস গ্রহণ করা।

শ্লোক ১৫ ঃ এইভাবে সে গৃহে ঠিক একটি পোষা কুকুরের মতো থাকে এবং অবহেলাভরে তাকে যা দেওয়া হয়, তাই সে খায়। অগ্নিমান্দ্য, অরুচি আদি নানা রকম রোগগ্রস্ত হয়ে, সে কেবল অল্প একটু আহার করে, এবং অক্ষম হওয়ার ফলে, কোন রকম কাজ করতে পারে না।

তাৎপর্য ঃ মৃত্যুর পূর্বে মানুষকে অবশ্যই রোগগ্রস্ত এবং অক্ষম হয়ে পড়তে হয়, এবং সে যখন তার পরিবারের সদস্যদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়, তখন নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার ফলে, তার জীবন একটি কুকুরের থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে যায়।তাই বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই প্রকার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পৌঁছাবার পূর্বেই মানুষের কর্তব্য গৃহত্যাগ করা, এবং আত্মীয়-স্বজনদের থেকে দূরে মৃত্যুবরণ করা। মানুষ যদি গৃহত্যাগ করে, আত্মীয়-স্বজনদের জানবার কোন রকম সুযোগ না দিয়ে মৃত্যুবরণ করে, তা হলে তাকে মহিমান্বিত মৃত্যু বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সংসারে আসক্ত মানুষ চায় যে, তার মৃত্যুর পরেও তার পরিবারের লোকেরা এক বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে তাকে বহন করে নিয়ে যাবে। যদিও সে নিজে সেই শোভাযাত্রাটি দেখতে পাবে না, তবুও সে আকাঙ্ক্ষা করে যে, জাঁকজমক সহকারে শোভাযাত্রার মাধ্যমে তার দেহটি যেন নিয়ে যাওয়া হয়। সে যদিও জানে না যে, তার দেহ ত্যাগের পর পরবর্তী জীবনে সে কোথায় যাবে, তবুও সে নিজেকে সুখী বলে মনে করে।

শ্লোক ১৬ ঃ সেই রুগ্ন অবস্থায়, ভিতরের বায়ুর চাপে, তার চক্ষু ঠিকরে বেরিয়ে আসে, এবং কফের দ্বারা তার শ্বাসনালী রুদ্ধ হয়ে যায়। তার নিঃশ্বাস নিতে তখন খুব কষ্ট হয় এবং তার গলা দিয়ে 'ঘুর-ঘুর' শব্দ বের হয়।

শ্লোক ১৭ ঃ এইভাবে সে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে। তার আত্মীয় এবং বন্ধুরা তাকে ঘিরে তখন শোক করতে থাকে, এবং যদিও সে তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তবুও কালপাশের বশবর্তী হয়ে সে আর তাদের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।

তাৎপর্য ঃ মানুষ যখন মৃত্যু শয্যায় শয়ন করে, তখন লৌকিকতা প্রদর্শন করার জন্য তার আত্মীয়-স্বজনেরা আসে, এবং কখনও কখনও তারা মৃত ব্যক্তিকে "হে পিতা!" "হে বন্ধু!" অথবা "হে পতিদেবতা!" ইত্যাদি বলে মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে। সেই করুণ অবস্থায় মৃত্যুর পথযাত্রী তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় এবং তার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে চায়, কিন্তু যেহেতু সে তখন সম্পূর্ণরূপে কালের বা মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সে আর কিছু বলতে পারে না, এবং তার ফলে সে অবর্ণনীয় বেদনা অনুভব করে। তার ব্যাধির জন্য সে ইতিমধ্যেই এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক অবস্থায় রয়েছে, এবং তার গ্রন্থিগুলি ও কণ্ঠ কফের দ্বারা রুদ্ধ হয়ে গেছে। সে এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক অবস্থায় রয়েছে, এবং তার আত্মীয়-স্বজনেরা যখন এইভাবে তাকে সম্বোধন করে ক্রন্দন করে, তখন তার শোক বর্ধিত হয়।

শ্লোক ১৮ ঃ এইভাবে, অসংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কুটুম্বভরণে ব্যাপৃত ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজনদের এইভাবে ক্রন্দন করতে দেখে গভীর দুঃখে তার প্রাণ ত্যাগ করে। সে অসহ্য বেদনায় অচেতন হয়ে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

তাৎপর্য ঃ *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় মানুষ সেই চিন্তায় মগ্ন হয়, যা সে সারা জীবন অনুশীলন করেছে। যে ব্যক্তি সারা জীবন তার পরিবারের ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয় চিন্তা করেনি, তার অন্তিম সময়ে পারিবারিক বিষয়ের কথাই চিন্তা হবে। সাধারণ মানুষদের জন্য এইটি স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষ তার নিয়তি সম্বন্ধে অবগত নয়; সে কেবল তার ক্ষণস্থায়ী জীবনে তার পরিবার প্রতিপালনেই ব্যস্ত থাকে। অন্তিম অবস্থায়, তার পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য সে যা করেছে, তাতে কেউই সন্তুষ্ট হতে পারে না; সকলেই মনে করে যে, সে যথেষ্ট আয়োজন করে যেতে পারেনি। পরিবারের প্রতি এই গভীর আসক্তির ফলে, তার জীবনের প্রধান কর্তব্য ইন্দ্রিয় সংযম এবং পারমার্থিক চেতনার উন্নতি সাধনের কথা সে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। অনেক সময় মৃত্যুর পথযাত্রী ব্যক্তি তার পুত্র অথবা অন্য কোন আত্মীয়দের উপর পরিবারের দায়িত্ব অর্পণ করে বলে, "আমি চলে যাচ্ছি। তুমি পরিবারের দেখাশোনা করো।" সে জানে না সে কোথায় যাচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় কিভাবে তার পরিবারের প্রতিপালন হবে, সেই চিন্তায় সে ব্যাকুল হয়। কখনও কখনও দেখা যায় যে, মৃত্যুর পথযাত্রী ব্যক্তি চিকিৎসকের কাছে অনুরোধ করে, তিনি যেন তার আয়ু আরও কয়েক বছর অন্তত বাড়িয়ে দেন, যাতে তার পরিবার প্রতিপালনের জন্য সে যে-সমস্ত পরিকল্পনাগুলি করেছিল, সেইগুলি সম্পূর্ণ করে যেতে পারে। এইগুলি হচ্ছে বদ্ধ জীবের ভবরোগ। সে তার আসল কৃষ্ণভক্তির কথা ভুলে যায় এবং সর্বদা ঐকান্তিকভাবে পরিকল্পনা করে, কিভাবে তার পরিবার প্রতিপালন হবে, যদিও সে একের পর এক পরিবার পরিবর্তন করছে।

শ্লোক ১৯ ঃ মৃত্যুর সময়, সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতদের সে তার কাছে আসতে দেখে, এবং তখন মহাভয়ে সে মল-মূত্র ত্যাগ করতে থাকে।

তাৎপর্য ঃ বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর, জীবের দুই প্রকার দেহান্তর হয়। এক প্রকার দেহান্তর হচ্ছে পাপকর্মের নিয়ন্ত্রণকারী যমরাজের কাছে যাওয়া, এবং অন্যটি হচ্ছে বৈকুণ্ঠলোক পর্যন্ত উচ্চতর লোকে যাওয়া। এখানে ভগবান কপিলদেব বর্ণনা করেছেন, ইন্দ্রিয় সুখভোগ পরায়ণ যে-সমস্ত মানুষ পরিবার প্রতিপালনের কাজে ব্যস্ত থাকে, তাদের সঙ্গে যমদূতেরা কিভাবে আচরণ করে। যে সমস্ত মানুষ প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করেছে, মৃত্যুর সময় যমদূতেরা

তাদের তত্ত্বাবধায়ক হয়। তারা মৃত ব্যক্তিকে যমালয়ে নিয়ে যায়। সেখানকার অবস্থা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২০ ঃ রাজ্যের পাহারাদারেরা যেমন অপরাধীকে দণ্ড দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার করে, তেমনই যে-ব্যক্তি অপরাধজনক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যে যুক্ত ছিল, তাকে যমদূতেরা একটি শক্ত দড়ি দিয়ে তার গলায় বাঁধে এবং তার সূক্ষ্ম দেহকে আবৃত করে, যাতে তাকে অত্যন্ত কঠোর দণ্ড দেওয়া যায়।

তাৎপর্য ঃ প্রতিটি জীবই সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের দ্বারা আচ্ছাদিত। সূক্ষ্ম দেহটি হচ্ছে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্তের আবরণ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যমদূতেরা অপরাধীর সূক্ষ্ম দেহ আচ্ছাদিত করে যমালয়ে নিয়ে যায়, যেখানে তাকে এমনভাবে দণ্ড দেওয়া হয়, যা সে সহ্য করতে পারে। সেই দণ্ডভোগের ফলে তার মৃত্যু হয় না, কারণ যদি সে মরে যায়, তা হলে সেই দণ্ড কে ভোগ করবে? কাউকে হত্যা করা যমদূতদের কার্য নয়। প্রকৃত পক্ষে, জীবকে হত্যা করা কখনই সম্ভব নয়, কারণ বাস্তবে সে হচ্ছে নিত্য। তাকে কেবল তার ইন্দ্রিয় সুখভোগের কর্মের ফল ভোগ করতে হয়।

চৈতন্য-চরিতামৃতে দণ্ডদানের বিধি বর্ণিত হয়েছে। পুরাকালে রাজার প্রহরীরা কয়েদিকে একটি নৌকায় করে মাঝনদীতে নিয়ে যেত এবং সেখানে তার চুলের মুঠি ধরে সম্পূর্ণরূপে জলের নীচে তাকে ডোবানো হত এবং যখন তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে যেত, তখন রাজার প্রহরীরা তাকে জল থেকে তুলে অল্পক্ষণের জন্য কেবল শ্বাস নিতে দিত এবং তার পর আবার তকে জলে ডোবানো হত। ভগবৎ বিস্মৃত জীবেদের যমরাজ এইভাবে দণ্ড দেন, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হবে।

শ্লোক ২১ ঃ এইভাবে যমদূতেরা যখন তাকে নিয়ে যায়, তখন তার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং তার সর্ব শরীর কাঁপতে থাকে। পথিমধ্যে কুকুরেরা তাকে কামড়াতে থাকে এবং তখন সে তার সমস্ত পাপকর্মের কথা স্মরণ করে। এইভাবে সে অত্যন্ত ব্যথিত হয়।

তাৎপর্য ঃ এই শ্লোক থেকে মনে হয় যে, এই লোক থেকে যমলোকে যাওয়ার সময়, যমদূতদের দ্বারা বন্দি অপরাধীর সঙ্গে অনেক কুকুরের সাক্ষাৎ হয় এবং তাকে তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অপরাধজনক কার্যকলাপের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য গর্জন করে এবং তাকে কামড়ায়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, যখন কেউ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তখন সে অন্ধ হয়ে যায় এবং তার সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সে সব কিছু ভুলে যায়। *কামৈস্তৈস্তৈ-*

হৃতজ্ঞানা"। কেউ যখন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়, তখন সে তার সমস্ত বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, এবং সে ভুলে যায় যে, তার পরিণাম তাকে ভোগ করতে হবে। এখানে যমরাজের কুকুরদের দ্বারা সে তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যকলাপের কথা মনে করার সুযোগ পায়। আমাদের স্থূল দেহে জীবিত থাকার সময়, আধুনিক সরকারও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির এই সমস্ত কার্যকলাপে অনুপ্রাণিত করে। সারা পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রে, জনগণ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির দ্বারা এই ধরনের কার্যকলাপে সরকার কর্তৃক অনুপ্রাণিত হচ্ছে। মেয়েদের জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পিল সরবরাহ করা হচ্ছে,এবং তাদের হাসপাতালে ও ডাক্তারখানায় গর্ভপাত করতে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ফলে এই সমস্ত হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে, যৌন জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুসন্তান উৎপাদন করা, কিন্তু মানুষের যেহেতু তাদের ইন্দ্রিয়ের উপর কোন সংযম নেই এবং ইন্দ্রিয় সংযমের শিক্ষা দেওয়ার কোন প্রতিষ্ঠান নেই, তাই সেই সমস্ত দুর্ভাগা ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অপরাধের শিকার হয়, এবং মৃত্যুর পর তাদের দণ্ডভোগ করতে হয়, যার বর্ণণা *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকগুলিতে করা হয়েছে।

শ্লোক ২২ ঃ অপরাধীকে তীব্র সূর্য-কিরণে, তপ্ত বালুকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হয়, যার দুপাশে দাবানল জ্বলে। সে যখন হাঁটতে অসমর্থ হয়, তখন যমদূতেরা তার পিঠে চাবুক দিয়ে আঘাত করে, এবং সে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় পীড়িত হলেও দুর্ভাগ্যবশত সেখানে কোন জল নেই, আশ্রয় নেই এবং বিশ্রামের কোন স্থান নেই।

শ্লোক ২৩ ঃ যমালয়ের পথে যেতে যেতে সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে যায়, এবং কখনও কখনও সে অচেতন হয়ে পড়ে, কিন্তু তাকে জোর করে উঠতে বাধ্য করা হয়। এইভাবে শীঘ্রই তাকে যমরাজের সামনে নিয়ে আসা হয়।

শ্লোক ২৪ ঃ এইভাবে দুই-তিন মুহূর্তের মধ্যে তাকে নিরানব্বই হাজার যোজন পথ অতিক্রম করতে হয়, এবং তার পর তাকে তৎক্ষণাৎ ঘোর যন্ত্রণাদায়ক দণ্ড দান করা হয়, যা ভোগ করতে সে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য ঃ এক যোজন হচ্ছে আট মাইল, অতএব তাকে ৭,৯২,০০০ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। এই দীর্ঘ দূরত্ব কেবল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অতিক্রম করতে হয়। যমদূতেরা সূক্ষ্ম শরীরকে আচ্ছাদিত করে, যাতে জীব এই দীর্ঘ পথ শীঘ্রই অতিক্রম করতে পারে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারে। সেই আবরণটি যদিও জড়, তা এত সূক্ষ্ম উপাদান দিয়ে তৈরি, যা বড় বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারে না, এই আবরণটি কি বস্তু। কয়ক মুহূর্তের মধ্যে ৭,৯২,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করা আধুনিক অন্তরীক্ষ যাত্রীদের কাছে

আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে। তারা এখন পর্যন্ত কেবল ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল গতিতে ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে, যমদূতেরা যখন পাপীদের যমালয়ে নিয়ে যায়, তখন তারা কেবল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ৭,৯২,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে, যদিও এই পন্থাটি চিন্ময় নয়, জড়।

শ্লোক ২৫ ঃ তাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে রেখে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দগ্ধ করা হয়, কখনও কখনও তার নিজের মাংস তাকে খেতে বাধ্য করা হয় অথবা অন্যেরা তার মাংস খায়।

তাৎপর্য ঃ এই শ্লোকটি থেকে পরবর্তী তিনটি শ্লোকে যমালয়ে দণ্ডের বর্ণণা করা হবে। প্রথম বর্ণনাটি হচ্ছে, অপরাধীকে আগুনে দগ্ধ হয়ে, নিজের মাংস খেতে হয় অথবা সেখানে তার মতো যারা উপস্থিত, তারা তার মাংস খায়। গত মহাযুদ্ধের সময়, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কখনও কখনও নিজেদের বিষ্ঠা মানুষকে খেতে হয়েছিল, সুতরাং যারা অন্যের মাংস খেয়ে অত্যন্ত আনন্দদায়ক জীবন যাপন করেছিল, যমালয়ে তাদের যে নিজেদের মাংস খেতে হয়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

শ্লোক ২৬ ঃ নরকের কুকুর এবং শকুনিরা তার নাড়ি সকল টেনে বার করে, এবং তা সত্ত্বেও সে জীবিত থাকে এবং তা দেখে। সর্প, বৃশ্চিক, দংশক ইত্যাদি প্রাণী তাকে দংশন করে এবং তার ফলে সে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে।

শ্লোক ২৭ ঃ তার পর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি খণ্ড খণ্ড করে কাটা হয় এবং হস্তীর দ্বারা বিদীর্ণ করা হয়। তাকে পর্বতশৃঙ্গ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়, এবং জলে অথবা গুহায় তাকে অবরুদ্ধ করা হয়।

শ্লোক ২৮ ঃ পুরুষ এবং স্ত্রী, যাদের জীবন অবৈধ যৌন আচরণের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়েছিল, তাদের তামিস্র, অন্ধতামিস্র এবং রৌরব নামক নরকে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য ঃ জড়-জাগতিক জীবন যৌন জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবন সংগ্রামে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করছে যে-সমস্ত জড়বাদী ব্যক্তি, তাদের অস্তিত্ব যৌন সুখভোগের উপর অধিষ্ঠিত। তাই, বৈদিক সভ্যতায় কেবল সীমিত যৌন জীবনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে; তা কেবল বিবাহিত দম্পতির সন্তান উৎপাদনের জন্য। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য অন্যায়ভাবে এবং অবৈধভাবে যৌন সংযোগ হয়, তখন পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়কেই এই জগতে অথবা মৃত্যুর পর কঠোর দণ্ডভোগের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়। এই পৃথিবীতেও সিফিলিস, গনোরিয়া

আদি তীব্র যন্ত্রণাদায়ক রোগে তাদের শাস্তিভোগ করতে হয়, এবং পরবর্তী জীবনে, যন্ত্রণা ভোগের জন্য তাদের নানাবিধ নরকে নিক্ষেপ করা হয়, যার বর্ণণা *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতার* প্রথম অধ্যায়েও অবৈধ যৌন জীবনের তীব্রভাবে নিন্দা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যারা অবৈধ যৌন জীবনের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন করে, তাদের নরকে নিক্ষেপ করা হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সেই সমস্ত অপরাধীদের তামিস্র, অন্ধতামিস্র এবং রৌরব নরকে নিক্ষেপ করা হয়।

শ্লোক ২৯ ঃ ভগবান কপিলদেব বললেন—হে মাতঃ! কখনও কখনও বলা হয় যে, এই পৃথিবীতেই নরক অথবা স্বর্গের অনুভব হয়, কারণ কখনও কখনও এই পৃথিবীতেও নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখা যায়।

তাৎপর্য ঃ কখনও কখনও নাস্তিকেরা নরক সম্বন্ধে শাস্ত্রের এই বর্ণণা বিশ্বাস করে না। তারা এই প্রকার প্রামাণিক বর্ণনার অবহেলা করে। ভগবান কপিলদেব তাই তা প্রতিপন্ন করে বলেছেন যে, এই পৃথিবীতেও সেই সমস্ত নারকীয় অবস্থা দেখা যায়। এমন নয় যে, তা কেবল যমলোকেই হয়। যমলোকে সেই নারকীয় পরিস্থিতিতে পাপীদের থাকবার সুযোগ দেওয়া হয়, যা তাকে তার পরবর্তী জীবনে সহ্য করতে হবে, এবং তার পর তাকে সেই নারকীয় জীবন ভোগ করার জন্য, অন্য আর একটি লোকে জন্ম গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, নরকে যদি কোন ব্যক্তিকে মল-মূত্র খাওয়ার দণ্ড দেওয়া হয়, সেইটি প্রথমে সে যমলোকে অভ্যাস করে, এবং তার পর তাকে শূকরের শরীরের মতো একটি বিশেষ শরীর দেওয়া হয়, যাতে সে মল-মূত্র আহার করে মনে করে যে, সে তার জীবন উপভোগ করছে। পূর্বে বলা হয়েছে, যে-কোন নারকীয় অবস্থায় বদ্ধ জীব মনে করে, সে সুখী। তা না হলে, তার পক্ষে নরক যন্ত্রণা ভোগ করা সম্ভব হত না।

শ্লোক ৩০ ঃ যে মানুষ পাপ কর্মের দ্বারা নিজেকে এবং তার পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ করেছিল, এই শরীর ত্যাগ করার পর, তাকে নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, এবং তার আত্মীয়-স্বজনদেরও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য ঃ আধুনিক সভ্যতার ভ্রান্তি হচ্ছে এই যে, মানুষ পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করুক বা না-ই করুক, পরবর্তী জীবন রয়েছে, এবং কেউ যদি *বেদ, পুরাণ* আদি প্রামাণিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দায়িত্বশীল জীবন যাপন না করে, তা হলে তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে। মনুষ্যেতর প্রাণীরা তাদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী নয়, কারণ তাদের কোন এক বিশেষভাবে আচরণ

করানো হয়, কিন্তু মনুষ্য চেতনা-সমন্বিত বিকশিত জীবনে, কেউ যদি তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী না হয়, তা হলে তাকে এখানকার বর্ণনা অনুসারে, তাকে অবশ্যই নারকীয় জীবন ভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৩১ ঃ তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর, সে একলা নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করে, এবং অন্য প্রাণীদের প্রতি হিংসা করে সে যে-ধন অর্জন করেছিল, সেই পাপকে পাথেয়রূপে সে সঙ্গে নিয়ে যায়।

তাৎপর্য ঃ মানুষ যখন অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করে তার পরিবার এবং নিজের ভরণ-পোষণ করে, তখন সেই ধন পরিবারের সমস্ত সদস্যরাই উপভোগ করে, কিন্তু তাকে একলা নরকে যেতে হয়। যে মানুষ অর্থ উপার্জন করে অথবা অন্যের প্রতি হিংসা করে জীবন উপভোগ করে, এবং যে পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে জীবন উপভোগ করে, তাকে এই প্রকার হিংসা পরায়ণ এবং অন্যায় আচরণ-জনিত পাপ কর্মের ফল একলা ভোগ করতে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, কেউ যদি কাউকে হত্যা করে ধন সংগ্রহ করে এবং সেই ধন দিয়ে তার পরিবার প্রতিপালন করে, তখন তার অর্জিত সেই অভিশপ্ত ধন যারা ভোগ করেছিল, তাদেরও আংশিকভাবে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং নরকে যেতে হবে, কিন্তু যে প্রধান কর্তা তাকে বিশেষভাবে দণ্ডভোগ করতে হয়। জড় সুখভোগের ফল হচ্ছে যে, কেউ তার ধন-সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না, সে কেবল তার পাপ কর্মের ফল সঙ্গে নিয়ে যায়। যে ধন-সম্পদ সে উপার্জন করেছিল, তা তাকে এই পৃথিবীতে রেখে যেতে হয় এবং সে কেবল তার কর্মফল সঙ্গে নিয়ে যায়।

এই পৃথিবীতেও কোন মানুষ যদি কাউকে হত্যা করে কিছু ধন সংগ্রহ করে, তার পরিবারের সদস্যেরা যদিও সেই পাপের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, তবুও তাদের ফাঁসি দেওয়া হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তিটি হত্যা করেছে এবং তার পরিবার প্রতিপালন করছে, তাকেই হত্যাকারীরূপে ফাঁসি দেওয়া হয়। পাপ কর্মের জন্য অপ্রত্যক্ষভাবে যে-ভোগ করেছে, তার থেকে প্রত্যক্ষভাবে যে অপরাধ করেছে, সে বেশি দায়ী। মহান জ্ঞানী চাণক্য পণ্ডিত তাই বলেছেন যে, মানুষের কাছে যা কিছু আছে, তা সব যেন সৎকার্যে বা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, কারণ সে তার সম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে না। সেইগুলি এইখানেই থাকে এবং তা নষ্ট হয়ে যায়। হয় আমরা ধন-সম্পদ ছেড়ে চলে যাই, অথবা ধন-সম্পদ আমাদের ছেড়ে চলে যায়। আমাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই হয়। তাই, যতক্ষণ ধন-সম্পদ আমাদের অধিকারে থাকে, ততক্ষণ কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্য তা ব্যয় করা উচিত।

শ্লোক ৩২ ঃ এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থাপনায় কুটুম্ব পোষণকারী ব্যক্তিকে তার পাপ কর্মের ফল ভোগ করার জন্য নারকীয় অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয়, তার অবস্থা তখন হৃত-সর্বস্ব ব্যক্তির মতো হয়।

তাৎপর্য ঃ এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে, পাপীরা ঠিক একটি হৃত-সর্বস্ব ব্যক্তির মতো কষ্টভোগ করে। বদ্ধ জীব বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং এইটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এই জীবনের সদ্ব্যবহার না করে, কেউ যদি তার তথাকথিত পরিবার প্রতিপালনের জন্য কেবল তা ব্যবহার করে, তা হলে বুঝতে হবে সে অত্যন্ত মূর্খের মতো এবং অবৈধভাবে আচরণ করছে, তার তুলনা সেই ব্যক্তির সঙ্গে করা হয়েছে, যে তার সমস্ত ধন-সম্পদ হারিয়ে ফেলেছে, এবং হারাবার ফলে শোক করছে। ধন-সম্পদ হারিয়ে গেলে, সেই জন্য শোক করে কোন লাভ হয় না, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ধন-সম্পদ রয়েছে, ততক্ষণ তা যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং তার দ্বারা শাশ্বত লাভ প্রাপ্ত হওয়া উচিত। এখানে কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, মানুষ যেহেতু তার পাপ কর্মের দ্বারা অর্জিত ধন ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, তাই সে তার ধন-সম্পদের সঙ্গে তার পাপ কর্মও ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদিও মানুষ তার পাপ কর্মার্জিত ধন ফেলে রেখে যায়, তবুও দৈবের ব্যবস্থাপনার (*দৈবেনাসাদিতম্*) সে তার কর্মের ফলটি সঙ্গে নিয়ে যায়। কেউ যখন ধন চুরি করে, ধরা পড়ার পর সে যদি তা ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়, তবুও তাকে সেই অপরাধের দণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়া হয় না। রাষ্ট্রের আইনে, সে টাকা ফিরিয়ে দিলেও, তাঁকে দণ্ডভোগ করতে হয়। তেমনই, অপরাধের দ্বারা অর্জিত ধন মৃত্যুর সময় যদিও ফেলে রেখে যেতে হয়, কিন্তু দৈবের ব্যবস্থাপনায় সে তার কর্মের ফল সঙ্গে নিয়ে যায়, এবং তাই তকে নারকীয় জীবন ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ৩৩ ঃ অতএব, যে ব্যক্তি অবৈধ উপায়ের দ্বারা তার পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজন পালনে অত্যন্ত উৎসুক, সে অন্ধতামিস্র নামক নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য ঃ এই শ্লোকে তিনটি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *কেবলেন* মানে 'কেবল অবৈধ উপায়ের দ্বারা,' *অধর্মেণ* মানে পাপপূর্ণ বা অধার্মিক', এবং *কুটুম্বভরণ* মানে 'পরিবারের ভরণ-পোষণ।' পরিবারের ভরণ-পোষণ করা অবশ্যই গৃহস্থের কর্তব্য, কিন্তু তাকে শাস্ত্রসম্মত বিধি অনুসারে জীবিকা অর্জন করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান গুণ এবং কর্ম অনুসারে সমাজ

ব্যবস্থাকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করেছেন। *ভগবদ্গীতা* ছাড়াও, প্রতিটি সমাজে গুণ এবং কর্ম অনুসারে মানুষের পরিচিতি হয়। যেমন, কেউ যখন কাঠের আসবাপত্র তৈরি করে, তাকে বলা হয় ছুতোর মিস্ত্রি, এবং কেউ যখন নিহাই এবং লোহা নিয়ে কাজ করে, তাকে বলা হয় কামার। তেমনই ডাক্তারি অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে যে-সমস্ত মানুষ যুক্ত, তাদের বিশেষ কর্তব্য এবং উপাধি রয়েছে। মানব-সমাজের এই সমস্ত কার্যকলাপের বিভাগ ভগবান করেছেন চারটি বর্ণে, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। *ভগবদ্গীতায়* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের বিশেষ কর্তব্যসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

মানুষের কর্তব্য তার যোগ্যতা অনুসারে সৎভাবে কর্ম করা। অন্যায়ভাবে কোন কিছু অর্জন করা উচিত নয়। অন্যায়ভাবে বলতে বোঝায়, সে যে-কার্যের যোগ্য নয়, সেই কার্যের দ্বারা। কোন ব্রাহ্মণ যদি ধর্মাচার্যের পদে নিযুক্ত থাকে, যার কর্তব্য হচ্ছে তার অনুগামীদের পারমার্থিক জীবনের জ্ঞান দান করা, তার যদি ধর্ম-যাজক হওয়ার যোগ্যতা না থাকে, তা হলে সে জনসাধারণকে প্রতারণা করছে। অন্যায়ভাবে কখনও কিছু সংগ্রহ করা উচিত নয়, এই নীতিটি ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের বেলায় প্রযোজ্য। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাঁরা কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁদের জীবিকা নির্বাহের উপায় অত্যন্ত সৎ এবং সরল হওয়া উচিত। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্যায় উপায়ের দ্বারা (*কেবলেন*) তার জীবিকা অর্জন করে, তাকে নরকের অন্ধতম প্রদেশে নিক্ষেপ করা হয়। অন্যথায়, কেউ যদি শাস্ত্রোক্ত বিধিতে এবং সৎ উপায়ে তাঁর পরিবার প্রতিপালন করেন, তা হলে গৃহস্থ হতে কোন আপত্তি নেই।

শ্লোক ৩৪ ঃ সমস্ত কষ্টকর নারকীয় অবস্থা ভোগ করার পর এবং নিম্নতম পশু-জীবন থেকে মনুষ্য জন্মের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত স্তর ক্রমশ অতিক্রম করে, এবং এইভাবে দণ্ডভোগ করার মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে, সে পুনরায় এই পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করে।

তাৎপর্য ঃ কারগারে দণ্ডভোগ করার পর, ঠিক যেমন একটি কয়েদিকে পুনরায় মুক্ত করা হয়, তেমনই যে-ব্যক্তি সর্বদা পাপ আচরণে যুক্ত থেকে অন্যায়ভাবে আচরণ করেছে, তাকে নারকীয় অবস্থায় রাখা হয়, এবং কুকুর, বিড়াল, শূকর আদি নিম্ন স্তরের পশুদের নারকীয় জীবন ভোগ করার পর, সে পুনরায় মনুষ্যরূপে ফিরে আসে। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগ অনুশীলনে রত ব্যক্তির যদি সিদ্ধি লাভের পূর্বে কোন না কোন কারণে যোগভ্রষ্ট হয়, তা হলে তার পরবর্তী জীবনে তিনি নিশ্চিতরূপে মনুষ্য-জন্ম লাভ করবেন। সেখানে

উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই প্রকার যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি অত্যন্ত ধনী অথবা অত্যন্ত পুণ্যবান পরিবারে জন্ম গ্রহণ ক'রে পুনরায় পরমার্থের পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পান। 'ধনী পরিবার' বলতে সম্ভ্রান্ত বৈশ্য পরিবার বোঝানো হয়েছে, কারণ সাধারণত যাঁরা ব্যবসা বাণিজ্যে যুক্ত, তাঁরা অত্যন্ত ধনী হন। যে ব্যক্তি আত্ম-উপলব্ধির পন্থায় যুক্ত হয়েছেন, অথবা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েছেন, তিনি যদি এই জীবনে সিদ্ধি লাভ না করতে পারেন, তা হলে এই প্রকার ধনী পরিবারে অথবা পুণ্যবান ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁকে জন্ম গ্রহণ করতে দেওয়া হবে; উভয় ক্ষেত্রেই, তিনি তাঁর পরবর্তী জীবনে মনুষ্য-সমাজে জন্ম গ্রহণ করার নিশ্চয়তা লাভ করেছেন। এখানে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কেউ যদি তামিস্র অথবা অন্ধতামিস্রের মতো নারকীয় জীবনে প্রবেশ করতে না চান, তা হলে তাকে অবশ্যই কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যা হচ্ছে সর্বোত্তম যোগ পদ্ধতি, কারণ তিনি যদি এই জীবনে পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি লাভ না করতে পারেন, তা হলে অন্তত পরবর্তী জীবনে তিনি যে-মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাঁকে নরকে নিক্ষেপ করা যাবে না। কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে শুদ্ধতম জীবন, এবং তা মানুষকে নরকে পতিত হয়ে, কুকুর অথবা শূকর যোনিতে জন্মগ্রহণ করা থেকে রক্ষা করে।

তৃতীয় অধ্যায়

শান্তির সূত্র

প্রকৃতির বিধিবিধানগুলি সংযুক্তভাবে অথবা পৃথকভাবে কাজ করে থাকে। নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত অথচ দৃঢ় বক্তব্যের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন যে, বর্তমান সমাজের সমষ্টিগত কর্মপ্রচেষ্টার জালে জড়িয়ে আমরা যেভাবে প্রতিহিংসা-পরায়ণ সর্বনাশের দিকে এগিয়ে চলেছি, তার থেকে যদি আমরা বেরিয়ে আসতে চাই—সমষ্টিগতভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে যদি আমরা শান্তি লাভ করতে চাই—তাহলে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন ও প্রচার করতেই হবে।

আধুনিক সভ্য সমাজে মানুষের মস্ত বড় দোষ হল যে তারা অন্যের সম্পত্তিকে নিজের দখলে আনার চেষ্টা করে যেন সেটা তাদের নিজের সম্পত্তি। যার ফলে প্রকৃতির বিধিবিধানগুলোর ওপর অযথা বাধা বিপত্তির সৃষ্টি হয়। এই সব বিধিবিধানগুলো খুবই কঠিন। কোনও জীবই এগুলোকে লঙ্ঘন করতে পারে না। একমাত্র যারা কৃষ্ণভক্ত তারাই কেবল এই কঠোর বিধিবিধানগুলোকে অতিক্রম করতে পারে। এইভাবে তারা পৃথিবীতে সুখী হন ও শান্তি ভোগ করেন।

যেমন যেকোনও রাষ্ট্রে কিছু আইন থাকে যেগুলো রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত রাখে, তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাষ্ট্রব্যবস্থায়—এই পৃথিবীও যার একটি নগণ্য ক্ষুদ্র অংশ, সেই রাষ্ট্রব্যবস্থাও প্রকৃতির বিধিবিধান দিয়ে সুরক্ষিত। এই জড়া প্রকৃতিও ভগবানের বিভিন্ন শক্তিরাশির একটি অংশমাত্র, যিনি সব কিছুরই পরম অধিকর্তা। সেই কারণে এই পৃথিবীও ভগবানেরই সম্পত্তি। কিন্তু জীবগণ, বিশেষত তথাকথিত সভ্য-মানুষজাতি, ভগবানের সমস্ত সম্পত্তিকে নিজেদের বলে মনে করে। ফলে তা নিজেদের আয়ত্তে নিতে চায়। কিন্তু আপনি যদি প্রকৃত শান্তি চান, তবে নিজের মন থেকে সেইসাথে সমগ্র পৃথিবী থেকে আপনাকে এই মালিকানার ভ্রান্ত ধারণা মুছে ফেলতে হবে। কারণ পৃথিবীর সকল সম্পদরাশির ওপর মালিকানা নিয়ে মানবজাতির এই ভ্রান্ত ধারণাই এই জগতে শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে সব রকমের অসুবিধার জন্য আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে দায়ী।

তথাকথিত সভ্য মানুষ হিসাবে বিবেচিত নির্বোধ মানুষরাই ভগবানের সমস্ত সম্পদের ওপর নিজেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার দাবি করতে শুরু করেছে, কারণ তারা ভগবৎ-জ্ঞানশূন্য। ভগবৎ-জ্ঞানশূন্য সমাজে কেউ কখনও সুখী হতে পারে না ও শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারে না। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনিই সকল জীবের সমস্ত রকম কার্যকলাপের যথার্থ ফলভোক্তা, তিনিই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর শ্রীভগবান, এবং তিনিই সকল জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। যখন সমস্ত মানুষ জানবে যে পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার এটিই একমাত্র তত্ত্ব, তক্ষুণি জগতে শান্তি বিরাজ করতে থাকবে।

তাই, প্রকৃতই যদি কেউ শান্তি চায়, তাহলে তাকে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের শুদ্ধ চেতনায় নিজের চেতনাকে নিয়ে আসতে হবে এবং সেইসাথে এককভাবে অথবা দলে দলে ভগবানের পবিত্র নাম জপ অভ্যাসের সহজ সরল পন্থাটি মেনে চলতে হবে। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের এটিই একমাত্র ও সর্বজন অনুমোদিত পন্থা। সেই কারণেই বলা হয় প্রত্যেকে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্রটি জপের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠুন।

এটিই বাস্তবসম্মত সহজ ও ভক্তি উৎপাদক পদ্ধতি। পাঁচশ বছর পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই মূলনীতিটি ভারতবর্ষে প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন, বর্তমানে এটি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। উপরিউক্ত পদ্ধতিতে জপ অনুশীলন করলে ও সেই সঙ্গে *ভগবদ্গীতা যথাযথ* গ্রন্থখানি প্রতিদিন একটু একটু করে পাঠ করলে ভগবানের সাথে আমাদের লুপ্ত সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। তার ফলেই অচিরে জগৎব্যাপী শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গৌরমোহন দে এবং মাতার নাম ছিল রজনী দেবী। ১৯২২ সালে কলকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘ) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগারো বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমন কি তিনি নিজ হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ তাঁকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ-রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাষ্য ও তাৎপর্যসহ আঠারো হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং *অন্য লোকে সুগম যাত্রা* নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা

ইস্‌কন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হচ্ছে তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাঁর রচিত বৈদিক দর্শনের এই সমস্ত গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্যসহ ইংরেজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যা প্রায় উনিশ শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এখানেই বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুশীলনের জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গিয়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এইরকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করেছেন।

১৯৭৭ সালের ১৪ই নভেম্বর এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চোদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচারসূচীর পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।